অত্যাগসহন

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

এক জন মানুষ প্রতি দিন সন্ধেবেলায় প্রায় একটা নির্দিষ্ট সময়ে বাড়ি ফিরে আসে। এক দিন সে ফিরল না। কোনও কোনও দিন ট্রেন লেট করে। কিংবা ঝড়-বৃষ্টির জন্য যানবাহন বিপর্যস্ত হলে দেরি হয়ে যায়। কিন্তু কত দেরি? বাড়ি তার প্রিয় জায়গা, সন্ধেবেলা বাড়ির বারান্দায় একটা হারমোনিয়াম নিয়ে বসা তাঁর নেশা। অন্য কোনও দিকে তার টান নেই তেমন।

মাস দু'এক আগে এক দিন একটা দুর্ঘটনার পর ট্রেন বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। সে খবর পাওয়া গিয়েছিল টিভি-তে। সুতরাং দুশ্চিন্তার কিছু নেই। অরিজিৎ ফোনেও জানিয়েছিল যে, সে দাঁড়িয়ে আছে শিয়ালদা স্টেশনের ভিড়ের মধ্যে। যদি ট্রেন আর নাই-ই চলে, তা হলে সে থেকে যাবে কোনও হোটেলে। টাকাপয়সার সমস্যা নেই। তার কাছে ক্রেডিট কার্ড আছে। তবু মধ্যরাত্রি পার হয়ে যাবার পর, এক সঙ্গে অনেকগুলো কুকুরের দৌড়দৌড়ি আর চ্যাঁচামেচির মধ্যে শান্ত ভাবে হেঁটে এসেছিল অরিজিৎ।

কী করে ফিরলে? একটা শেয়ারের ট্যাক্সি যাচ্ছিল ব্যারাকপুরের দিকে। সেই ট্যাক্সিতে রথতলা পর্যন্ত। সাত জন মিলে ঠাসাঠাসি। এত রাত্রে সাইকেল রিকশা পাওয়া যায় না। মাইল দেড়েক হাঁটতে হয়েছে। উফ্। যা গরম পড়েছে আজ!

এত কষ্ট করে ফিরতে গেলে কেন? হোটেলেই তো...
নিজের বালিশ ছাড়া কি ঘুম হয়? হোটেলের বালিশ... আমার কী রকম যেন গা ঘিনঘিন করে। এক যদি ফাইভ স্টার হয়! সত্যিই খুব প্যাচপেচে গরম ছিল সে দিন। বাতাস একেবারে নিরুদ্দেশ। এতটা পথ হেঁটে এসে সারা শরীর এমনই ঘর্মাক্ত যেন মনে হয় সে জলে ডুব

দিয়েছিল।

বাড়িতে ফিরেছে বলে খুশি হওয়ার বদলে বাড়ির কয়েক জন বরং আর ও উদ্বিগ্ন হয়েছিল। রথতলার মোড় জায়গাটা ভাল নয়। রাত্তিরের দিকে কোথা থেকে উদয় হওয়া দু'দল মানুষের মধ্যে মারামারি হয় প্রায়ই। কয়েক দিন আগেই তো এক দারুণ বলশালী চেহারার পঞ্জাবি পুরুষের লাশ পড়েছিল সেখানে।

মা বলেছিলেন, না বাপু, অত দেরি হলে তুই আর ওই দিন আসিস না। ফোন করে দিবি। হোটেলে থাকতে না চাস, রুপুর বাড়িতে...
রুপু অরিজিতের মাসতুতো বোন। তার স্বামী ম্যানেজার-তুল্য কোনও উচ্চ চাকরি করে। বাইশ শো স্কোয়ার ফুটের ফ্ল্যাট রডন স্ট্রিটে। এই সব ফ্ল্যাটে একখানা ঘর গেস্টরুম হিসেবে আলাদা করাই থাকে।

ঝুপঝাপ করে স্নান করে এসে, পাজামা ও স্যান্ডোগেঞ্জি পরে নিয়ে সে দিন অরিজিৎ ঘোষণা করেছিল, আমি কিন্তু কিছু খেয়ে আসিনি। সে আর রাতে ফিরবে না ধরে নিয়ে খাবার-টাবার সব তুলে দেওয়া হয়েছিল ফ্রিজে। সব কিছুই আছে। গরম করতে হবে। একেবারে হাতে গরম না হলে কোনও খাদ্যই তার মুখে রোচে না। এই কারণেই আইসক্রিম কিংবা দইও খায় না সে। তবে, কিছুদিন আগে কোনও এক দোকানে আইসক্রিম ভাজা পাওয়া যায় শুনে সে বেশ উৎসাহিত বোধ করেছিল।

এক এক করে ভাত, ডাল, বেগুন ভাজা ইত্যাদি গরম করা হচ্ছে। সেই ফাঁকে বারান্দায় এসে অরিজিৎ একটু গলা সেধে নিচ্ছিল। হারমোনিয়া

ম আর বার করেনি, সে গাইছিল। অমল ধবল পালে লেগেছে মন্দ মধুর হাওয়া/ দেখি নাই, কভু দেখি নাই...

এ বারান্দার সামনেই একটা পুকুর। তার ও-ধারে কিছু ফাঁকা জমি, তাতে কয়েকটা শিল পোঁতা আছে। এখনও বাড়ি ওঠেনি। উঠবে। দুটো তাল গাছ, তার একটাতে কিছু একটা রাত-পাখির বাসা। ডাক শুনলে চেনা যায় না। কিন্তু আজ কলকাতা শহরে কোনও বিপর্যয় ঘটেনি। ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক। ঝড়-বৃষ্টি নেই। তবু সে ফিরল না কেন? সে ফোনও করেনি।

তার কাছে মোবাইল ফোন থাকে। তাতেও কোনও সাড়া নেই। বন্ধ, কিংবা কার্ড ফুরিয়ে গেছে। তবু তো কোনও না কোনও ভাবে খবর দেওয়া যায়। সভ্যতার অগ্রগতি এখন সব রকম যোগাযোগের ব্যবস্থা করে ফেলেছে।

দুশ্চিন্তার কোনও কারণ নেই। এক দিন কোনও না কোনও কারণে তো আটকে যেতেই পারে। লাস্ট ট্রেন চলে গেলে এক রাতের জন্য নাহয় ক্ষমা-ঘেন্না করে শিয়ালদার কাছের কোনও হোটেলে থেকেই গেল। বালিশের ওয়াড়, বিছানার চাদর কি ওরা বদলে দেয় না?

তা ছাড়া এক জন চৌত্রিশ বছর বয়স্ক স্বাস্থ্যবান পুরুষ মানুষ একটা কিছু ব্যবস্থা করে নিতেই পারবে। রুপুর বাড়িতে যত্ন-আত্তির কোনও অভাব নেই। তবু সেখানে অরিজিৎ সহজে যেতে চায় না। কারণটা এতই তুচ্ছ যে, সে কারওকে বলেনি। রুপুদের ওখানে একটা নেকড়ের সাইজের অ্যালসেশিয়ান কুকুর আছে। তার ডাক শুনলে বুক কাঁপে। অর্থাৎ, যারা কুকুর ভালবাসে না, তাদের বুক কাঁপে। যারা কুকুর ভালবাসে, তাদের কাছে ওই মেঘগর্জনের মতন ডাকই সুধা বর্ষণ করে।

অরিজিতের মতে, যারা গান-বাজনা ভালবাসে, তাদের কুকুর পোষা উচিত নয়। কিংবা যারা কুকুর পোষে, তারা গান-বাজনা ভালবাসে না।

কুকুরের বিকট ডাকে সব সুর তছনছ হয়ে যায়। গরু-ছাগলের ডাকেও কিছুটা সুর থাকে। স্কেল ঠিক থাকে। কিন্তু কুকুরের মতন এমন বেসুরো প্রাণী আর হয় না। অরিজিৎ উবাচ।

টিভি-তে একটা পুরনো বাংলা ফিল্ম দেখাচ্ছে। যখন উত্তমকুমার এবং সৌমিত্র দু'জনেই এক সঙ্গে থাকতেন পর্দায়, সুচিত্রা সেন আর অরুন্ধতী মুখার্জির মধ্যে কে বেশি রূপসী এই নিয়ে তর্ক হত, সেই আমলের। গোটা পরিবার মিলে দেখতে দেখতে সাড়ে বারোটা বেজে গেল। কার ওরই খাওয়া হয়নি। ধরে নেওয়া হল, আর অরিজিতের এ রাতে ফেরার সম্ভাবনা নেই। বরং, না ফেরাই ভাল।

কিন্তু অন্য সকলের থেকে মায়ের একটা তফাত থাকবেই। মাতৃজাতির কারণে বা অকারণে উদ্বিগ্ন হওয়াই অভ্যেস। স্নেহ যুক্তিহীন। অতিরিক্ত স্নেহে অনেক মা প্রায় সময়েই সন্তানের মৃত্যু চিন্তা করেন। অর্থাৎ, এই বুঝি গাড়ি চাপা পড়া, এই বুঝি একটা গুন্ডা তার বুকে ছুরি বসিয়ে দিল ইত্যাদি। গোঁয়ারের মতন অরিজিৎ যদি আজও এত রাত্রে নিজের বালিশের মোহে একটা ট্যাক্সি-ম্যাক্সিতে করে আসতে চায়, সে দিনের মতন, তা হলে আবার সেই রথতলার মোড়, সেই ছায়াছায়া বাহিনীর উপদ্রব। যদি সেই শিখটির মতন রক্তাক্ত শরীরে...

মা ক্ষীণ গলায় বললেন, অভি, একটু দেখে আসবি নাকি? আর সবাই হা-হা করে উঠল আপত্তি জানিয়ে। অভিজিৎ কিন্তু নীচে নেমে গিয়ে সাইকেল বার করল। সে ভালই জানে, সে যদি এখন না যায়, মা তা হলে কিছু খাবেন না। বিছানায় যাবেন না। দাঁড়িয়ে থাকবেন অন্য দিকের বারান্দায়।

সাইকেলে উঠে একটা সিগারেট ধরিয়ে অভিজিৎ একটু হাসল। বড় ছেলের জন্য উৎকণ্ঠায় মা যে তাঁর ছোট ছেলেকে গভীর রাতে একটা বিপজ্জনক এলাকায় পাঠাচ্ছেন, এর মধ্যে যে স্নেহের একটা অন্ধ পক্ষপাতিত্ব আছে, তা মা নিজেই বোঝেন না। বড় ছেলেই সব সময়

পায় স্নেহের সিংহ ভাগ। অভিজিৎ জানে, সে যদি হঠাৎ কখনও মারা যায়, তা হলে মা যতটা শোক পাবেন, তার থেকে অনেক অনেক বেশি দাদার মৃত্যু সংবাদ পেলে...। এমনকী মা বোধহয় তখন পাগলই হয়ে যাবেন। এটা কি ইনস্টিংক্ট? চিরকাল খাওয়ার সময় দাদার পাতে বড় মাছের মুড়োটা, তাও কি ইনস্টিংক্ট?

অভিজিৎ এ সব কথা ভাবছে তার মায়ের ছোট ছেলে হিসেবে নয়, এটা এক জন লেখক হিসেবে তার পর্যবেক্ষণ। তার জীবনের পঞ্চম গল্পটি সদ্য প্রকাশিত হয়েছে দেশ পত্রিকায়।

তিন দিন কেটে গেছে। অরিজিতের কোনও খবর নেই। অরিজিৎ কাজ করে একটা বিজ্ঞাপন প্রতিষ্ঠানে। কয়েক বছর আগে কোম্পানিটি এ মনই রক্তাল্পতায় ভুগছিল যে, মনে হয়েছিল সে আর বাঁচানো যাবে না। ওপরের দিকের কয়েক জন এক্সিকিউটিভ ফুটো তরির মতন এ অফিস ছেড়ে চলেও গেছে অন্য হাতছানিতে। হঠাৎ বছর তিনেক আগে আবার কোম্পানির স্বাস্থ্য ফিরে গেল। ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট নামে নতুন উদ্যোগটি জুড়ে দেবার ফলেই এই উন্নতি। এখন এত কাজ যে দু'একটা কাজ প্রত্যাখ্যানও করতে হয়। কলকাতা তথা পশ্চিমবাংলার বাইরে থেকে অনেক ব্যবসা আসছে। কিংবা এখনও সব না এলেও উদ্যোগ চলছে। সেই উদ্যোগ পর্বে প্রচুর দেঁতো হাসির অনুষ্ঠান, সরকারের সঙ্গে করমর্দন, বড় বড় হোটেলে একের পিঠে অনেকগুলো শূন্য বসানো টাকার ঘোষণা, এই সবেরই ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব ইভেন্ট ম্যানেজমেন্টের।

তিন দিন আগে ফ্রি স্কুল স্ট্রিটের অফিস থেকে অন্যান্য দিনের মতন ঠিক সময়েই বেরিয়েছিল অরিজিৎ। সাড়ে ছ'টায়। তার পর সে...
অফিসের এই যে নতুন উইং, ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট, এ দিকটায় যোগ দেয়নি অরিজিৎ। সে আর্ট ওয়ার্ক, কপি এডিটিং-এর ভার নিয়েই আছে। অনুষ্ঠান ব্যবস্থাপনার কাজে বড় বেশি খাটতে হয়। নাওয়া-খাওয়ার সময় পাওয়া যায় না। সে জন্য আলাদা কমিশনেরও ব্যবস্থা করেছে কোম্পানি। অরিজিৎ তাতে আগ্রহী নয়। উপার্জন বৃদ্ধির উন্মাদনায় সে কখনও মেতে ওঠেনি। তাদের পরিবারটি মোটামুটি সচ্ছল।

অফিসে অরিজিৎ বেশ জনপ্রিয়। উঁচু-নিচু সব সহকর্মীর সঙ্গেই সে স
মান হাসিমুখে মেশে। আপাততঃ মনে হয়, সবাই তার বন্ধু। কিন্তু দুনিয়ার
এমন কোনও অফিস আছে কি যেখানে গুপ্ত দলাদলি, আড়ালে নিন্দে ও
পশ্চাৎদংশন নেই? কিছু কিছু মানুষ নিছক স্বার্থহীন ঈর্ষাতেও ভোগে।
সহকর্মীদের মধ্যে কে যে অন্য রকম, তা অরিজিৎ বোঝে না।

অফিস থেকে বেরিয়ে অরিজিতের শিয়ালদায় এসে ট্রেন ধরার কথা।
সাতটা কুড়ি কিংবা সাতটা বাহান্ন। দুটি ট্রেনই ঠিকঠাক চলেছে। অন্য
সব ট্রেনই সেদিনকার মতন সময়-বশ। অরিজিৎ কোনও ট্রেনেই চাপেনি
সম্ভবত। এবং সে ফোন করল না কেন?

তখন মনে পড়ে দুর্ঘটনার কথা। অফিস থেকে শিয়ালদা পর্যন্ত আসবার
পথে...। অভিজিৎ সমস্ত থানায় এবং হাসপাতালে। এ ব্যাপারে রুপুর
স্বামী রণদেবের সাহায্য নেওয়া হয়েছে। পুলিশের ওপর মহলে তার
চেনাশুনো। না, এমনকী মর্গে যে-সব আনক্লেইমড বডি ঠান্ডা হয়ে
আছে, তাদের মধ্যে ভূতপূর্ব অরিজিতের বডি নেই।

বাকি রইল অপহরণ। মুক্তিপণের জন্য। এটা এখন বেশ চলছে। এক
শ্রেণির দুষ্কৃতীর বেশ সহজ উপজীবিকা। রাস্তা থেকে টপ করে যে-
কোনও এক জনকে তুলে নিয়ে যাওয়া, শিশু থেকে বৃদ্ধ, যে-কেউ, তার
পর একটা অন্ধকার ঘর, আর বিকৃত গলায় টেলিফোনে হুমকি। তাতেই
কয়েক লাখ বা কয়েক কোটি টাকা এসে যায়। মাঝে মাঝে ওরা একটা
দুটো শিশুকে গলা টিপে মেরে রাস্তায় ফেলে দেয়। শুধু এটাই
বোঝাবার জন্য যে তাদের হুমকি মোটেই ফাঁকা আওয়াজ নয়।

কিন্তু অরিজিৎ তো ব্যবসায়ী পরিবারের অংশীদার নয়। মধ্যবিত্ত চাকুরি
জীবী। তার মতন হাজার হাজার মানুষ শিয়ালদা স্টেশন দিয়ে বাড়ি
ফেরে। তাকে গুম করে আর কত টাকা পাওয়া যাবে? মেরে কেটে
পাঁচ-সাত লাখ। নতুন তৈরি বাড়িটা বিক্রি করে দিলে আরও অনেকটা
বেশি হতে পারে। কিন্তু হুট করে তো বিক্রি করা যায় না। তার জন্য স

ময় লাগে। কোনও মুক্তিপণের দাবি এবং হুমকিও এল না সাত দিনের মধ্যে। বাড়িতে কে কে?

মা। মাতৃস্নেহ যতই তীব্র হোক, মাত্র তিন বছর আগে বিবাহিত এক যুবকের জীবনে তার স্ত্রীর ভূমিকা নিশ্চিত অনেক বেশি। এমন অনেক কথা, একটা বয়েসে পৌঁছে মাকেও বলা যায় না, কিন্তু স্ত্রী জানে। আবার স্ত্রীকেও বলা হয় না, এমন কিছু কিছু কথাও থাকে কোনও কোনও মানুষের জীবনে।

স্ত্রীর নাম সায়ন্তনী, সে দমদম মতিঝিল কলেজে ফিজিক্স পড়ায়। সে বাড়িতে কম কথা বলে, কিন্তু মুখখানা কখনও ঘুচিমুচি করে রাখে না। কেউ কৌতুক করলে তার হাসির শব্দ ভারী পরিষ্কার। যেন সেই হাসিতেই ফুটে ওঠে তার নির্মল হৃদয়।

বাড়ির কারও সঙ্গে সায়ন্তনীর এ পর্যন্ত কোনও কথা কাটাকাটি হয়নি। তা বলে অন্যদের সব কথাও সে মেনে নেয় না। সে স্বল্পবাক। সেটাই তার সুবিধে। এখনও সন্তান হয়নি। তাই সে অনেকটা স্বাধীন। জননী হলেই তার একটা অন্য রকম জীবন শুরু হবে।

সম্বন্ধ করা বিয়ে নয়। সোদপুরে বাড়ি করে চলে আসার আগে অরি জিৎদের পুরো পরিবার ভাড়া থাকত দক্ষিণ কলকাতায় মনোহরপুকুর রোডে। খুব কাছাকাছি সায়ন্তনীদের বাড়ি। পরিচয় হয়েছিল, কিন্তু তে মন কিছু গাঢ় নয়। প্রণয়ের প্রশ্নই ওঠে না। তার পর অরিজিৎরা চলে গেল দূরে, সে সময় সায়ন্তনীর সঙ্গে দেখাই হয়নি। সে তখন ঘাটশিলায়। সুতরাং কোনও নাটকীয় বিদায়-দৃশ্যও ঘটেনি। কত পরিবার ই তো পাড়া বদল করে।

কয়েক বছর পর দু'জনের দেখা হল এক মধুযামিনীতে। সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের ছাদে। মঙ্গল গ্রহ বহু বছর পর পৃথিবীর খুব কাছাকাছি চলে এসেছিল সে বার। একটা বিজ্ঞান ক্লাব মস্ত টেলিস্কোপে

সেটা দেখার ব্যবস্থা করেছিল। অ্যাস্ট্রোনমির ছাত্রী হিসেবে সায়ন্তনী তো সেখানে যেতেই পারে। কিন্তু তাদের পূর্বতন প্রতিবেশী এই যুবকটিকে দেখে বেশ অবাক হয়েছিল সায়ন্তনী। আগে মনে হত, এর তেমন কোনও বৈশিষ্ট্য নেই। অথচ মহাকাশ সম্পর্কে এত আগ্রহ? চেনাশুনো কোনও অধ্যাপককে ধরে অরিজিৎ এসেছে এখানে।

সাতাশ-আঠাশ জন নানা বয়েসের নারী পুরুষ, কয়েক জন অধ্যাপক, সেন্ট জেভিয়ার্সের দু'জন ফাদার। চা-কফি, বেশ একটা নৈশ পিকনিকের মতন। সায়ন্তনী আর অরিজিৎ দু'জনেরই অন্য চেনা বিশেষ কেউ নেই। তাই তারা বসেছে পাশাপাশি। মঙ্গল গ্রহটি এখন এত কাছে, যেন বাড়ির পাশের কোনও আকাশপ্রদীপ। মৃদু-মন্দ, নরম বাতাস। লাল রঙের গ্রহটিকে নানান ভাবে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখতে দেখতে এরা দু'জনে যেন চলে গেল মহাশূন্যে, যদিও গায়ে গায়ে ঠেকাঠেকি হল কয়েক বার। তা জাগতিক স্পর্শ, তাতে উষ্ণতা আসে।

তার পর আকাশ থেকে চোখ নামিয়ে শহরের রাস্তায় ও উদ্যানে আরও দেখা হল কয়েক বার। আড়াই মাস পর অরিজিৎই এক দিন লাজুক লাজুক মুখে বলল, আমি এ পর্যন্ত বিয়ের কথা কখনও ভাবিনি। কিন্তু আমরা যদি...।

বিয়ের পরেও ওদের পটভূমিকায় রয়ে গেল মহাকাশ। বাবা। রিটায়ার করলেও বেশ শক্ত সমর্থ চেহারা। দ্রুত মেজাজ বদলায়। ছোট ভাই অভিজিৎ। বিধবা দিদি মণিদীপা, তার ছেলে শুভঙ্কর, সতেরো। আরও এক জন মাঝ বয়েসী মহিলা, কোনও রক্তের সম্পর্ক নেই, সোনা পিসি। এখনও যৌথ পরিবার।

এতগুলি মানুষের সংসারে মাত্র এক জনের অনুপস্থিতিতে সব কিছু যেন তছনছ হয় যাবার মতন অবস্থা। বাজার হয় না, রান্না হয় না, কোনও র কমে সোনা পিসির হাতে রান্না হলেও কেউ-ই পুরোপুরি খেতে চায় না। একমাত্র অভিজিৎই স্টেশনের কাছে ফ্রেন্ডস ক্যাবিন থেকে কিছু না

কিছু, চিকেন কাটলেট পেলে তাই-ই খেয়ে নেয়। সে খিদে সহ্য করতে পারে না। এক মাস সতেরো দিন কেটে গেল, অরিজিতের কোনও রকম সংবাদ নেই। সে পাতলা বাতাসে অদৃশ্য হয়ে গেছে।

অত্যাগসহন

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

এক জন বিবাহিত পুরুষ যদি বাস্তবের পটভূমিকা থেকে, অর্থাৎ নিজের ঘর-সংসার, অফিস, বন্ধু- বান্ধবের মধ্য থেকে অকস্মাৎ অদৃশ্য হয়ে যায়, তা হলে সকলেরই প্রথম কৌতূহলের দৃষ্টি পড়ে স্ত্রীর দিকে।

কী হয়েছিল আগের দিন? খুব ঝগড়া, কিছু দিন ধরেই ভুল বোঝাবুঝি, আলাদা বিছানা, যখন-তখন অন্তর টিপ্পনী? তৃতীয় কেউ আছে মাঝখানে? প্রিয়ব্রত অত ঘন ঘন আসত কেন? আর ওই মেয়েটা, স্বস্তিকা, যাকে দেখলেই অস্বস্তি হয়, জিনসের ওপর বোতাম- টোতাম ছাড়া জামা পরে। এক দিন তো রাত্তিরে থেকেই গেল! কিংবা এর অফিসে, ওর কলেজে....।

এই সব প্রশ্ন অনেকেই সরাসরি করে না। চোখে ঝুলিয়ে রাখে। কেউ কেউ আকারে- ইঙ্গিতে। শুধু মা- বাবার শ্রেণি, যাঁরা অত শিষ্টতার ধার ধারেন না, ছেলেকে হারাবার ব্যাকুলতায় অত সূক্ষ্মতা বজায় রাখা সম্ভবও না, তাঁরা জিজ্ঞেস করেন, সায়ন্তনী, কী হয়েছিল বলো তো? তুমি ছাড়া আর কে জানবে? তোমাদের মধ্যে ঝগড়া....।

কাটা কাটা ক্ষুদ্র বাক্য বলা সায়ন্তনীর অভ্যেস। সে তা হঠাৎ বদলাবে কী

করে?

সে শুধু উত্তর দেয়, না তো!

সে দিন যে সকালে বেরুলো জিৎ, তোমার অন্য রকম কিছু মনে হয়নি?

না।

অফিসে কিছু গণ্ডগোল চলছিল কি?

জানি না।

টাকা-পয়সা নিয়ে কিছু গণ্ডগোল, মানে হঠাৎ কোনও কারণে বাইরে যাওয়ার কথা হয়েছিল?

আমাকে বলেনি কিছু।

এই মেয়ের সঙ্গে কথা চালিয়ে যাওয়া শক্ত।

যাঁরা প্রশ্ন করছেন, তাঁদেরও প্রশ্নের মধ্যে অবিশ্বাস বা সন্দেহের আঁচ নেই। সায়ন্তনীকে যে সবারই খুব পছন্দ ছিল। এ পর্যন্ত।

দেড় মাসের বেশি হয়ে গেল, জলজ্যান্ত স্বামীটির কোনওই জীবন- চিহ্ন নেই। তবু তার স্ত্রী এক বারও কাঁদল না। চুল উল্টে মাটিতে শুয়ে রইল না। চোখের নীচে কালো দাগ পড়ল না। ব্রা পরতেও ভুলে যায় না। এ আবার কেমন ধারা মেয়ে! পাড়াপড়শিরা তো ঠেস দেওয়া মন্তব্য কর বেই। কিন্তু বাড়ির কেউ কোনও বিপরীত চিন্তা মনে স্থান দেয় না। তারা তো এই ক'বছর ধরে দেখেছে, যে মেয়ে সাত চড়ে রা কাড়ে না, যার বুক ফাটলেও মুখ ফুটবে না, সায়ন্তনী যে ঠিক সে রকম। সে বাথরুমে গিয়ে এক গঙ্গা কেঁদে ভাসালেও অন্য কারও সামনে চক্ষু ছলছলও করবে না কক্ষনও। এ মেয়ে এ রকমই। কী আর করা যাবে! ওর দুঃখ বেদনার বহিরঙ্গ প্রকাশ অন্যরা দেখতে না পেয়ে কিছুটা নিরাশ হয়।

মায়ের সঙ্গেই সবচেয়ে বেশি ভাব সায়ন্তনীর। মায়ের একটা নাম আছে তো নিশ্চয়ই। কিন্তু এ কাহিনিতে তার প্রয়োজন নেই। মা শুধু মা। অনেকের ধারণা, পৃথিবীর সব মা- ই এক। মাতৃত্ব ব্যাপারটা সর্বজনীন। স্নেহের সাগর হয়ে বসে থাকাই তাঁদের কাজ। তা মোটেই ঠিক নয়। বাচ্চা বয়সে অনেক মেয়েই তো থাকে ঝগড়ুটি, ঈর্ষা পরায়ণ, স্বার্থপর। তারা কি পরবর্তী জীবনে মা হয়ে একেবারে বদলে যায়? বরং বাচ্চা বয়সে অনেক মেয়েরই স্বার্থজ্ঞান থাকে না। সেটা আসে পরিণত বয়সে। সব স্নেহের মধ্যেই যে কিছুটা লুক্কায়িত থাকে স্বার্থ, তা তো কবেই জানা হয়ে গেছে।

যে জননীর পুত্র- কন্যা দুই-ই থাকে, সকলের না হলেও সে রকম অনেক

জননীরই বেশি টান থাকে ছেলেদের প্রতি। নেহাত শেষ বয়সে যদি ছেলে দুরাচার কিংবা বউয়ের আঁচল ধরা ভেড়া হয়ে যায়, তখন অসহায় জননী আঁকড়ে ধরতে চান মেয়েকে। নইলে মেয়ের চেয়ে ছেলেই মায়ের বুকে অনেকটা বেশি জায়গা পায়। তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ এ বাড়ির মা।

প্রথম সন্তান জন্মের তিন দিন পরই চলে যায়। লিঙ্গ বিচারে সেই মৃত শিশুটি ছিল পুত্র। তার পর দ্বিতীয় সন্তানের প্রতীক্ষায় মায়ের তীব্র আকাঙ্ক্ষা ছিল পুত্রের। মনে মনে জপ করতেন ছেলে ছেলে ছেলে। গর্ভের সাত মাসেই নাম রাখতে শুরু করতেন, সবই পুরুষ নাম। জন্মাল একটি মেয়ে, তাও তার গায়ের রং শ্যামলা।

এই রকম অবস্থায় দু'চার জন মহিয়সী জননীই শুধু মেয়েকে বুকে জড়িয়ে তৃপ্তি পান। অন্যদের মনে আসে নৈরাশ্য। এবং রাগ। যেন এই মেয়েটা জোর করে একটা ছেলের বদলে এ বাড়িতে ঢুকে পড়েছে। যেন তার জন্মটা তার ইচ্ছে- অনিচ্ছে নির্ভর। তবে চার- পাঁচ বছর বয়স হতে না হতেই সেই কন্যা বুঝতে পেরেছিল, মা তাকে ভালবাসে না।

প্রথমে তার নাম রাখা হয়েছিল শ্যামা। স্কুলে ভর্তি করাবার সময় তার এক মাসি এসে জোর করে তার নাম রাখে মণিদীপা। শ্যামা নামটা এখন গ্রাম্য তালিকায় চলে গেছে। দীর্ঘ সাত বছর পর আবার পর পর দুটি পুত্র সন্তান। অরিজিৎ আর অভিজিৎ। এ বাড়ির মায়ের তেমন উৎফুল্ল মুখ আর আগে কেউ দেখেনি। সারা বাড়িতে খুশির হিল্লোল। অরিজিৎ নামটি মণিদীপার জন্মের আগে থেকেই জমিয়ে রাখা ছিল।

দুটি ছেলের তুলনায় বাড়ির বড় মেয়েটি যে অনেকটা অনাদরেই বর্ধিত হচ্ছিল, তা অনেকেই লক্ষ করেছে। কিন্তু বাইরের লোক তো কিছু বলতে পারে না। শুধু ছোট মাসি, অর্থাৎ রুপুর মা মণিদীপাকে মাঝে মাঝে নিজের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে রাখতেন। সে বাড়িতে আবার রুপু একমাত্র সন্তান। হোক না মেয়ে, তবু বড় আদরের। কলেজে পড়া শেষ করতে না করতেই মণিদীপা পর পর দুটো অন্যায় করে ফেলে। বাবা-

মায়ের অমতে বিবাহ, এবং তার চেয়েও বড় অন্যায়, কয়েক বছরের মধ্যেই বিধবা হওয়া।

সুপ্রকাশকে পছন্দ হয়নি, কারণ তার চালচুলো নেই, বাউণ্ডুলে, উদ্ধত স্বভাব, গুরুজনদের সামনে সিগারেট খায়। প্রেমিকার বাবা- মায়ের সঙ্গে কথা বলতে এসে সে ফস করে সিগারেট ধরিয়েছিল। এ রকম কেউ কখনও দেখেছে? এবং, ইয়ে, মানে, সে খুব নিচু জাত। জাতের উল্লেখ শুনে রাগ করেনি সুপ্রকাশ। হাসতে হাসতেই বলেছিল, আমরা যে নিচু জাত, তা কে ঠিক করেছে? বামুনরা তো? এখন আমরা ঠিক করেছি, বা মুনরাই নিচু জাত। মানুষ কখনও সমান হবে না, উঁচু- নিচু থাকবেই। এ যুগে বামুনদেরই নীচে থাকার পালা। দেখে আসুন না তামিলনাড়ুতে!

কোনও নিষেধ না শুনে এক সন্ধেবেলা রেজিস্ট্রি বিয়ে সেরে মণিদীপা এল মা- বাবাকে প্রণাম করতে। বাবা চুপ করে রইলেন। মা পা ছুঁতে দিলেন না। মেয়ের তো এর মধ্যেই জাত গেছে।

সুপ্রকাশ বাড়ির মধ্যে ঢোকেনি, ট্যাক্সি নিয়ে অপেক্ষা করছিল বাইরে। কয়েকটা মাত্র শাড়ি- ব্লাউজ নিয়ে সে রাত্রেই পিতৃগৃহ ত্যাগ করল মণিদীপা। চলে তো গেল তেজ দেখিয়ে। কিন্তু আবার ফিরে আসতে তো হল!

ক্যানসার ধরা পড়ার পর সুপ্রকাশের আয়ু আর সাত মাস মাত্র। এ এক অদ্ভুত অসুখ, বাঁচানো যাবে না জেনেও চিকিৎসায় সর্বস্বান্ত হতে হয়। সুপ্রকাশের উপার্জন ছিল অনিয়মিত। ব্যয়ে বেহিসাবি, থাকত ভাড়াবাড়িতে। সে চলে যাবার পর প্রচুর ধারটার নিয়ে খুবই বিপদে পড়ে গিয়েছিল মণিদীপা। উপায়ান্তর ছিল না বলেই বালক পুত্রের হাত ধরে সে শুধু গ্রাসাচ্ছাদনের কারণেই ফিরে এসেছিল বাপের বাড়িতে।

কিন্তু কান্নাকাটি, অনুতাপ বা দয়া প্রার্থনা করেনি মোটেই সে। দ্বিতীয় দিনেই সে জানিয়ে দিয়েছিল, যে দু'জন তাকে পৃথিবীতে এনেছে,

তার রক্ষণাবেক্ষণের অনেকটা দায়িত্বও সে দু'জনেরই। এ বাড়িতে সে করুণা ভিক্ষা কিংবা আশ্রয়প্রার্থী হয়ে আসেনি, এসেছে নিজের অধিকারে। পিতৃ সম্পত্তিতে অন্য ভাইদের মতন তারও সমান অধিকার।

বসবার ঘরে সর্বসমক্ষে যখন এ কথা বলছিল মণিদীপা, মা হতবাক, বাবার চোখ খবরের কাগজে, তখন তাকে প্রথম সমর্থন জানায় অরিজিৎ। এ বাড়ি ছেড়ে যাবার পরেও দিদির সঙ্গে তার যোগাযোগ ছিল। সুপ্রকাশের সঙ্গে বেশ ভাব ছিল তার। দিদিদের যাদবপুরের বাড়িতে বেশ কয়েক বার গিয়ে সে মুড়ি ডিমভাজা খেয়েছে। চকলেট কিনে দিয়েছে দিদির ছেলেকে।

সে বলেছিল, দিদি এখানে থাকবে নিজের রাইটে। আমাদের নতুন বাড়িতেও দিদির জন্য সমান জায়গা রাখতে হবে। কন্যাকে যে স্নেহ দেননি, এ বাড়ির মা সেই স্নেহ ঢেলে দিয়েছেন পুত্রবধূকে। শাশুড়ি-বউয়ের ঝগড়া নিয়ে কত না গতানুগতিক কাহিনি ছড়ানো হয় নানান মাধ্যমে। এ বাড়িতে তার লেশমাত্র নেই।

বিয়ের পর পরই মা লক্ষ করেছিলেন, স্বামীকে তার মায়ের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে নেওয়ার কোনও চেষ্টা নেই নববধূর। অনেক বাড়িতে তো সেটাই দেখা যায়। এ বউ কিন্তু যখন- তখন দরজা বন্ধ করে স্বামীর সঙ্গে গুজুর গুজুর ফুসুর ফুসুর করে না। ন'মাসে ছ'মাসে তারা বাইরে কোথাও বেড়াতে গেলেও সায়ন্তনী নিজে এসে আগে শ্বশুর- শাশুড়ির অনুমতি চায়। তখনও এই নতুন বাড়িটা তৈরি হয়নি, আগেকার ভাড়াবাড়িতে জায়গার খুব টানাটানি ছিল, বিশেষত মণিদীপা এসে পড়ার পর। কিন্তু কখনও তা নিয়ে মুখ ব্যাজার করেনি সায়ন্তনী।

তা ছাড়া, উচ্চশিক্ষিত, কলেজে পড়ানো বউ হয়েও সে প্রতি রাতে মা-বাবার বিছানার চাদর ঠিক করে দেয়। কিছুক্ষণ ওঁদের সঙ্গে বসে টিভি দেখে। অর্থাৎ বয়স্কদেরও যে কিছুটা সময় ও সাহচর্য দিতে হয়, সে জ্ঞান আছে। বাড়ির সহবত ভাল। শুধু সায়ন্তনী নিজে পান খায় না, পান সাজতেও জানে না।
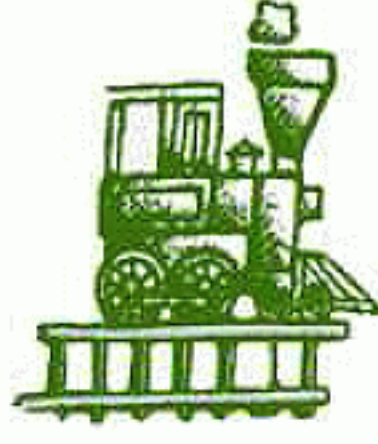
যে- সব কারণে এক জন সুস্থ, সমর্থ যুবক বাড়ি না ফিরতে পারে, তার একটাও মিলল না দেখে আর একটি কথা মনে আসে! রুপু আর রণদেব গাড়ি নিয়ে আসে প্রায়ই। কারওই মন ভাল নেই, তবু দু'মাস ধরে তো মানুষ একটানা মুখ ভার করে থাকতে পারে না। দেখা হলে প্রথ ম কিছুক্ষণ ভ্রূকুঞ্চিত কথা হয়। তার পর অন্য প্রসঙ্গ এসে পড়বেই। এ মনকী কখনও কখনও হাসি -ঠাট্টাও হয়। তবে কেউ জোরে হেসে উঠলে সবাই এক সঙ্গে চুপ করে যায়।

রণদেবই বললেন, আমার শ্যালকটি শেষ পর্যন্ত সন্ন্যাসী হয়ে গেল না তো?
অভিজিৎ ঠোঁট বেঁকিয়ে বলল, দাদা? সন্ন্যাসী? এর থেকে অদ্ভুত কথা আমি আগে কখনও শুনিনি। হি ওয়াজ, আই মিন, হি ইজ অ্যাবসলিউটলি অ্যাগনস্টিক।

রণদেব বললেন, তুমি ঠিকই বলছিলে, মে বি হি ওয়াজ অ্যাগনস্টিক। কিন্তু হঠাৎ তো ধর্ম- টর্মের দিকে মতি হতে পারে। এ রকম হয় কারও কারও।
অভিজিৎ বলল, সকালবেলা মানুষটা স্বাভাবিক ছিল, অন্য দিনের মতনই বেরিয়েছে, সারা দিন অফিসে ঠিকঠাক কাজ করেছে, সে তো আ মরা বার বার খবর নিয়ে জেনেছি। তার পর হাতটাত ধুয়ে অফিস থেকে বেরুবার পরই কি মানুষটার দিব্য দর্শন হল? রাবিশ! এ রকম হঠাৎ কিছু হয় না।

সবাই বসেছে সায়ন্তনীর ঘরে। মা- বাবা এখানে সহসা আসেন না। রুপু- রণদেব এলেই আড্ডা জমে।
মণিদীপা বলল, ছোটবেলায় জিতু রাস্তা- ঘাটে কোনও মন্দির দেখলেই প্রণাম করত।
রুপু বলল, সে তো তোমাদের বাড়িতে তখন এক জন রান্নার লোক ছিল। কী যেন নাম, বাসুদেব, তাই না? সে আবার পুজোটুজোও করত

নিজের ঘরে বসে। তাকে দেখে জিতু শিখেছিল।

অভিজিৎ জিজ্ঞেস করল, ছোটবেলা, মানে কত ছোটবেলা? বড় জোর, আট ন'বছর বয়স পর্যন্ত। ওই সময়টা মানুষের জীবনে ধর্তব্যের মধ্যেই পড়ে না। ওই সময় বাচ্চারা যেমন বড়দের অনুকরণ করে, তেমনই ফড়িং ধরে ডানা ছিঁড়ে ফেলে। কুকুরের ল্যাজে তারাবাজি বেঁধে দেয়। বিভূতিভূষণ যতই বাচ্চা বয়সটা গ্লোরিফাই করুন, আসলে....

রুপু অপ্রাসঙ্গিক ভাবে বলল, সন্ন্যাসীদের বেশ মজা। খাওয়া- পরার চিন্তা করতে হয় না। ও সব আপনা- আপনি এসে যায়।
স্ত্রীর দিকে ফিরে রণদেব বললেন, তোমারও যেমন অদ্ভুত কথা! তা হলে আমাদের দেশের সত্তর- আশি লক্ষ বেকার রাতারাতি সন্ন্যাসী হয়ে গেলেই পারে। অনেক সমস্যা চুকে যায়।
মণিদীপা বলল, সাধু হলেও জিতুকে কে সব সময় যত্ন করে গরম গর ম খাবার দেবে? গরম ছাড়া কিছু ছুঁতে পারে না।
সায়ন্তনী যথারীতি নির্বাক শ্রোতা। ঠোঁটে হালকা হাসি। কথা ঘুরে যায় নানা দিকে।

রুপুর ননদের দেশের এক বন্ধু, তার নাম স্বপ্নেশ, বিয়ের দেড় বছরের মধ্যে তার ডিভোর্স হয়ে যায়। মেয়েটি ভারী গুণী, ভাল সেতার বাজায়, নামকরা পরিবারের কন্যা। আর ছেলেটিও ইঞ্জিনিয়ার। তবু বিয়ে টিকল না কেন? মেয়েটিই অভিযোগ করেছে, তার স্বামী আর সব দিক থেকে ভাল। কিন্তু বিছানায় অকর্মণ্য। একেবারেই যৌন- শীতল। রাতের পর র াত এ অবস্থা সহ্য করা যায় না। ছেলেটিও এ অভিযোগ মেনে নিয়েছে। সে ভেবেছিল, বিয়ের পর সে অন্য দিকে মন ফেরাতে পারবে। কিন্তু সম্ভব হল না। হস্টেল- জীবন থেকেই সে সমকামী।

এটা একটা পরিচিত ঘটনা। সবাই জানে, তবু নতুন করে আজ আবার আলোচনা শুরু হল কেন? কয়েক জনের মনে ঘুরছে একটাই প্রশ্ন। কিন্তু কে সে প্রশ্নটা জিজ্ঞেস করবে সায়ন্তনীকে? বড়ই অরুচিকর, মুখে উচ্চার

ণ করা যায় না।

প্রশ্নটা ঠিকই বুঝেছে সায়ন্তনী। রণদেব তার দিকে এক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকায় সেও মুখে কিছু না বলে দু'দিকে মাথা নাড়ল। অভিজিৎ অত সূক্ষ্মতা না মেনে জোর গলায় বলল, আমি জানি, আমার দাদা মোটেই হোমো নয়। বউদির সামনেই বলছি, বিয়ের আগেও দাদা অন্তত গোটা দু'এক ছুটকো- ছাটকা প্রেম করেছে।

রণদেব তাড়াতাড়ি বললেন, সে তো আমরা সবাই করেছি। আজকাল মেয়েরাও বিয়ের আগে... স্বামী- হারা সায়ন্তনীর এখন স্বল্প বাক হওয়াটা বেশ মানিয়ে যায়। জীবনের কতকগুলো নিজস্ব দাবি আছে। তা মেনে নিতেই হয়। এক জন অনুপস্থিত বলে অন্যদের প্রতি দিনের প্রবাহ থেমে থাকতে পারে না। এখন আবার নিয়মিত বাজার হয়, রান্না হয়, মাছের ঝোলে বেশি রাগ হয়েছে বলে বাবা রাগারাগি করেন। মা যখন তখন দীর্ঘশ্বাস ফেলেন, আঁচল দিয়ে চোখ চাপেন। আবার অভ্যেসে টিভি সিরিয়ালও দেখেন। বেশি রাত্রে এক সঙ্গে অনেকগুলো কুকুর ডাকলে ছুটে যান বারান্দায়।

মণিদীপা এখানে এসে একটা স্কুলে কাজ পেয়েছে। মূল ঘটনার পর তিন দিনের বেশি কামাই করতে পারেনি। সায়ন্তনীও আবার কলেজে পড়াতে শুরু করেছে, সামনেই পার্ট টু- র পরীক্ষা। মায়ের নির্দেশে অভিজিৎ প্রথম কয়েক দিন বউদিকে কলেজ পর্যন্ত পৌঁছে দিচ্ছিল। সায়ন্তনীর মোটেই তা পছন্দ নয়। সে একা যায়, একা ফেরে।

অভিজিৎ এখনও বেকার। একটা এম এ ডিগ্রি আছে বটে, কিন্তু সে প্রতিজ্ঞা করে ফেলেছে, সে পড়াবার চাকরি করবে না। তার আগ্রহ খবরের কাগজের দিকে। কিন্তু সে পথে প্রচুর ঠ্যালাঠেলি। জলটুঙ্গি নামে একটা রেস্তোরাঁয় প্রতি সন্ধ্যায় তরুণ সাহিত্যিক বন্ধুদের আড্ডা জমে। সেখানে না গেলে অভিজিতের ভাত হজম হয় না। নিজেদের রচনা পাঠ, অনুপস্থিতদের নিন্দে, কোনও কোনও সম্পাদকের মুণ্ডপাত, তর্কাতর্কি, এ সবই তার কাছে অক্সিজেনের মতো। বিশেষ কোনও বন্ধুর লেখা মনে মনে অপছন্দ করতে করতে নিজের মাথায় নতুন লেখা আসে।

রাত একটু বাড়লে বন্ধুদের মধ্যে কয়েকজন যায় শুঁড়িখানায়। অভিজিৎ গাঁজা ও মদের নেশা একটু- আধটু শুরু করেছিল। এখন বন্ধুদের শত অনুরোধেও আর আড্ডার দ্বিতীয় পর্বে যায় না। ন'টার মধ্যে বাড়ি না ফিরলে মা এমন দাপাদাপি শুরু করেন যে প্রায় হিস্টিরিয়ার মতন অবস্থা হয়।

দাদাই তো তাকে এই বিপদে ফেলে দিয়ে গেছে। আগে দাদা নিজের বাবা- মায়ের সুপুত্র এবং স্ত্রী রত্নটির বাধ্য স্বামী হয়ে বাড়ি ফিরত ঠিকঠাক সময়ে। তাতেই সকলের শান্তি। পরের ছেলেটি কখন ফিরল না ফিরল, তা নিয়ে অন্যদের তেমন কিছু মাথাব্যথা ছিল না। সাড়ে দশটা, এগারোটা তো হতই। কয়েক বার বাবার কাছে বকুনি খেয়েছে, তা অভিজিৎ পাত্তাই দেয়নি। পরে বাবাও হাল ছেড়ে দিয়েছেন। বাড়ির বেকার ও অবিবাহিত ছেলের প্রতি তেমন কিছু নৈতিক শাসনের কড়াকড়ি থাকে না। এখন অভিজিৎকে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরতে হচ্ছে। নেশা- টেশাও আপাতত বন্ধ।

দাদার এই অন্তর্ধানের ব্যাপারে অভিজিৎ কখনও বিশেষ ভাবালুতা দেখায়নি। এটা তো একটা নিছক বাস্তব ব্যাপার। খোঁজাখুঁজির ব্যাপারে সে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছে ঠিকই, কিন্তু গালে হাত দিয়ে বসে থাকা কিংবা গলার কাছে বাষ্প জমানো, ও সব তার ধাতে নেই। বাস্তবের স্রোত কোন দিকে যায়, নির্লিপ্ত ভাবে তা লক্ষ করাই তো আধুনিকতা।

যেন তার দাদা নয়, এক জন যে কোনও মানুষ রহস্যময় ভাবে অদৃশ্য হয়ে গেছে। তার পর তার বাড়ির প্রতিটি সদস্যের প্রতিক্রিয়া সে আলাদা ভাবে, নিজেকে বিযুক্ত করে পর্যবেক্ষণ করে চলেছে। পর্যবেক্ষণ আর পর্যবেক্ষণ, এই তো সাহিত্য রচনার মূলমন্ত্র।

প্রতি রাতে ট্রেন থেকে নেমে স্টেশন থেকে বেরুবার সময় অবধারিত ভাবে এক বার দাদার কথা তার মনে পড়ে। কখনও নতুন ফুলকপি, কখনও ফ্রুটকেক কিনে বাড়ি ফিরত অরিজিৎ। ও সব অভিজিৎ জীবনে

পারবে না।

হঠাৎ আজ মনে হল, কেটে গেছে দু'মাস, দাদা কি আর কোনও দিনই বাড়ি ফিরবে না? দাদা কি বেঁচে নেই? হারিয়ে গেল চিরকালের মতন? আচমকা বুক ঠেলে কান্না এসে গেল তার। তাড়াতাড়ি সে চলে এল একটা অন্ধকার গাছতলায়। এই প্রথম সে কিছুতেই চোখের জল রোধ করতে পারছে না। মুচড়ে মুচড়ে উঠছে বুক।

অত্যাগসহন

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

একজন মানুষ নেই। অথচ সে আছে। কয়েকখানা ঘরে ছড়িয়ে আছে তার ব্যবহারের নানা জিনিস। এগুলো শুধু স্মৃতিচিহ্ন নয়, জীবন চিহ্ন। একটা সিগারেটের প্যাকেটে তিনটে সিগারেট। ঠিক ধূমপানের নেশা নেই অরিজিতের। শুধু সকালে ও রাত্তিরে তার দুটো সিগারেট লাগে। হারমোনিয়ামটার ওপর একটা স্বরলিপির বইয়ের পৃষ্ঠা খোলা। একটা র ামের বোতলে কিছুটা রাম। কম্পিউটারে একটা অসমাপ্ত ইংরিজি চিঠি। অরিজিৎ ফিরে এলেই এ সবের ব্যবহার শুরু হবে। কিন্তু সে ফিরছে না।

কলেজের গেটের মুখে স্বস্তিকা হাত ধরে দাঁড় করাল সায়ন্তনীকে। কলেজে সে জিন্স পরে আসে না। নিজেদের গাড়িও আনে না। শাড়ি পরিহিতা বাসযাত্রিণী হিসেবেই এক জন অধ্যাপিকাকে মানায়। তার একটা আলাদা ব্যক্তিগত জীবন তো থাকতেই পারে। তখন তার ইচ্ছে মতন পোশাক, সে একটা ক্লাবে গিয়ে তাসের জুয়া খেলতে ভালবাসে।

স্বস্তিকা বলল, তোর নোটবইতে একটা ফোন নাম্বার লিখে নে। সেই নাম্বারে আমি চেষ্টা করছি। তুই-ও দ্যাখ যদি পাস। কার ফোন নাম্বার? স্বস্তিকা বলল, নাম বলল অনসূয়া। অনসূয়া বন্দ্যোপাধ্যায়। বলল, তোকে আর আমাকে চেনে। আমি অবশ্য নাম শুনে..... তুই এই নামে কারুকে.....

সায়ন্তনীর স্মৃতিশক্তি ভাল। সে বলল, আমরা যখন দার্জিলিঙে বেড়াতে গেলাম, তখন ওই নামে এক জনের সঙ্গে। দু'দিন আমরা একই হোটেলে.....
স্বস্তিকা বলল, হ্যাঁ। মনে পড়ছে বটে, অনেকখানি পেট দেখানো ব্লাউজ

পরত ওই ঠান্ডার মধ্যেও, স্লাইট ট্যারা, তাতে মুখখানা বেশ ইন্টারেস্টিং দেখায়।
তার ফোন নাম্বার..... হঠাৎ কেন?
এত দিন কোনও যোগাযোগ ছিল না। আমার ফোন নাম্বার কী করে জানল.... হয়তো তখন দিয়েছিলাম, মনে নেই।
স্বস্তিকা, আমি তার ফোন নাম্বার লিখব কেন?

ওই মহিলা, মানে, অনসূয়া হঠাৎ কাল রাত্তিরে ফোন করে আমাকে একটা অদ্ভুত কথা বলল। হঠাৎ ফোনটা কেটেও গেল। তার পর অনেক চেষ্টা করেও আমি আর কানেকশান পাচ্ছি না।
এটা কি হেঁয়ালি হচ্ছে না?

ও এখন থাকে বেনারসে। আমাকে বলল, মণিকর্ণিকার ঘাটে অরিজিৎকে দেখেছে। সঙ্গে ইয়ে, মানে, আর এক জন কেউ ছিল। অরিজিতের সঙ্গে ওর চোখাচোখিও হয়েছে। কথা হয়নি অবশ্য।

এ রকম একটা কথা শুনলে প্রথমেই প্রশ্ন জাগে, বেনারসের ওই ট্যারা মেয়েটি কি জানে যে অরিজিৎ নিরুদ্দিষ্ট? কী করে জানবে, খবরের কাগজে তো কিছু বেরোয়নি। যদি সে না জানে, তা হলে, স্বল্প পরিচিত এক জন মানুষকে কাশীতে দেখতে পাওয়া কীসের এত গুরুত্বপূর্ণ, যা রাত্তির বেলা এক জনকে ফোনে জানাতে হবে, এক বছরের মধ্যে যার সঙ্গে ফোনে কখনও যোগাযোগ হয়নি?

পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছে ছাত্র-ছাত্রীরা। মিনিট তিনেক পরেই শুরু হবে ক্লাস। এখন বেশি কথা বলার সময় নেই। সাইকেল রিকশা থেকে নামল অধ্যাপক মনসিজ। ওদের দু'জনকে দেখলে সে এখানে দাঁড়াবেই। স্বস্তিকা জানে, অন্য সহকর্মীদের সঙ্গে সায়ন্তনী অরিজিৎ-প্রসঙ্গ

আলোচনা পছন্দ করে না।

এক হোটেলের পাশাপাশি ঘরে কিংবা দূর পাল্লার ট্রেনের কামরায় যাদের সঙ্গে দেখা হয়, খুবই অন্তরঙ্গতা, চায়ের দাম দেবার জন্য কাড়াকাড়ি, তার পর ঠিকানা ও টেলিফোন নাম্বার বিনিময়, অবশ্যই যোগাযোগের প্রতিশ্রুতি, তার পর আর কিছুই হয় না, পরস্পরের জীবন থেকে হারিয়ে যায়।

এই অনসূয়া নামের মেয়েটি দার্জিলিং-এ গিয়েছিল মা ও এক বোনের সঙ্গে, সায়ন্তনীদের ছিল পাঁচ জনের একটি দল, তাদের মধ্যে অরিজিৎ ছাড়া আর এক জন পুরুষ। যেহেতু অরিজিৎ গান গাইতে পারে, তাই সব আড্ডাতেই সে জমিয়ে দেয়। সেই গানের টানেই অনসূয়া এসে উঁকি মেরেছিল এদের আড্ডায়, তার পর প্রায় আড়াই দিন মা-বোনকে ছেড়ে এদের সঙ্গেই বেশি সময় কাটিয়েছে। সে-ও গান জানে মন্দ না। তার পর আর তার সঙ্গে বন্ধুত্ব বজায় রাখা কিংবা টেলিফোনে যোগাযোগ র াখার কোনও কারণ ঘটেনি।

সে অবশ্য অরিজিৎকে বেনারসে দেখতে পাওয়ার খবরটা জানাতেই ফোন করেনি। অরিজিতের সঙ্গে হঠাৎ দেখা হওয়ার পরেই তার মনে পড়েছে স্বস্তিকা আর সায়ন্তনীদের কথা। সেই সব কথা বলতে বলতেই ফোনটা কেটে যায়।

অরিজিৎ বেনারসে? সেখানে কেন যাবে সে? কোনও কারণ নেই। ওই অনসূয়া কাকে না কাকে দেখেছে। এক বছর পরেও অরিজিতের চেহারা কি তার সঠিক মনে থাকতে পারে? কথা বললেও না হয় বোঝা যেত?

আশ্চর্য ব্যাপার, এর পর সারা দিন ধরে অনেক বার সায়ন্তনী আর স্বস্তিকা ল্যান্ড ফোন আর মোবাইলেও অনেক চেষ্টা করেও বেনারসের সেই নাম্বার ধরতে পারল না। এক বার শোনা যায় এনগেজ্ড সাউন্ড, একবার রেকর্ড করা কণ্ঠ বলে, ইয়ে নাম্বার মজুত নেহি হ্যায়। মেয়েটি ভুল নাম্বার দিয়েছে? কিংবা স্বস্তিকা লিখতে ভুল করেছে? মহা অস্বস্তিকর ব্যাপার। মাঝ পথে কেটে যাওয়ায় সে নিজেই আবার ফোন করছে না কেন?

নিছকই ভুল খবর বলে ব্যাপারটা উড়িয়ে দেওয়া যায়। আবার যায়ও না। মনের ভেতর খচখচ করে। সায়ন্তনীর কি এখনই এক বার বেনারসে

যাওয়া উচিত? একটা উড়ো খবর শুনে সে বেনারসের রাস্তায় রাস্তায় একা ঘুরবে, কিংবা মণিকর্ণিকার ঘাটে বসে থাকবে?

অনসূয়া যাকে দেখেছে, সে যদি সত্যিই অরিজিৎ হয়, তা হলে এটুকু অন্তত জানা গেল, সে জীবিত এবং সুস্থ আছে। তার সঙ্গে অন্য কেউ ছিল। এই জানাই তো যথেষ্ট। অরিজিৎ স্বেচ্ছায়, কোনও রকম বিপদে না পড়ে যদি বাড়ি ছেড়ে কোথাও চলে গিয়ে থাকে, তা হলে সায়ন্তনী কিছুতেই তার খোঁজ নিতে যাবে না।

স্বস্তিকাকে সে বলল, বেনারসের এই ফোনের ব্যাপারটা তার শ্বশুর বাড়ির কাউকে জানাবার দরকার নেই। ওই মেয়েটি আবার কিছু জানায় কি না, তার জন্য অপেক্ষা করা যাক। পরপর কয়েকটি দিন কেটে গেল, বেনারস থেকে আর কোনও সাড়া নেই। রহস্য, না বিরক্তিকর ব্যাপার!

এ দিকে বাবা-মা চললেন জ্যোতিষীর কাছে। এটা রণদেবের ব্যবস্থাপনা। তার মতন কোনও বেসরকারি বড়কর্তার দুটো কান দু'দিকে বাঁধা রাখতে হয়। এক দিকে ক্ষমতায় থাকা কোনও রাজনৈতিক দলের নেতা, অন্য দিকে কোনও গুরুঠাকুর। কোনটি কখন কাজে লাগে তার ঠিক নেই। এই শ্রেণির মানুষ বেলুড় মঠে নিয়মিত যায় আর ক্যালকাটা ক্লাবে পরস্ত্রীর কোমর জড়িয়ে ওয়াল্‌ট্‌জ নাচে। এর মধ্যে কোনও দ্বন্দ্ব নেই।

অনেক অ্যালোপ্যাথি পাশ করা ডাক্তার যেমন হোমিওপ্যাথি প্র্যাক্টিস করেন, তেমনই এই গুরুদেবটি আগে ছিলেন ইঞ্জিনিয়ার। স্বয়ং অবস্থাপন্ন, সুতরাং পয়সার জন্য গুরুগিরি করেন না, তবে তাঁর ভক্তরাও সবাই উচ্চশ্রেণির।

রণদেব গাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছে, মা-বাবা যাবার জন্য তৈরি হচ্ছেন, সায়ন্তনী যাবে না আগেই জানিয়ে দিয়েছে। তার যে ধর্মে-কর্মে মতি নেই, তা শ্বশুরশাশুড়ি জানেন। তাঁরা তা মেনেও নিয়েছিলেন, বেশি লেখাপড়া জানা বউরা তো এ রকমই হয়।

হঠাৎ রণদেব ফোন করে জানাল, গুরুদেব অরিজিতের স্ত্রীকেও দেখতে চান। তাকে নিয়ে আসতেই হবে।

বাবা সংশয়ের সঙ্গে বললেন, ও কি যেতে রাজি হবে? যদি যেতে না চায়, তা হলে কি জোর করে....

মা বললেন, আমি রাজি করাচ্ছি।

সায়ন্তনীকে ডেকে তিনি বললেন, শোনো, গুরুদেব বলেছেন, তোমাকে কয়েকটা প্রশ্ন করবেন। মিতু সম্পর্কে তুমি যা জানো.....আমরা তো সব বলতে পারব না!

সায়ন্তনী বলল, সে কী মা? আপনাদের ছেলে, আপনারাই তো সব জানবেন, আমি তো বাইরে থেকে এসেছি।

বাবা বললেন, ছেলেপুলে প্রাপ্তবয়স্ক হলে বাবা-মা আর কতটা জানে তার কথা? সারা দিনে কটা কথা হয়?

পাছে তর্কাতর্কি হয়, সময়ও নেই, তাই মা তাড়াতাড়ি বললেন, সায়ন্তনী, তুই এ সব মানিস না জানি। কিন্তু আমরা অনুরোধ করলে তুই যাবি না? ইনি শিক্ষিত লোক, কথা বলতে তোর খারাপ লাগবে না। এর পর আর আপত্তি করা চলে না। সায়ন্তনী খুব তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নিল।

অরিজিৎ যদি জানত, তার খবরাখবরের জন্য এক জ্যোতিষী ও গুরুদেবের কাছে যাওয়া হচ্ছে, তা হলে তার কী প্রতিক্রিয়া হত? বর বার সে এই সব ব্যাপার নিয়ে ঠাট্টা-ইয়ার্কি করেছে। বিজ্ঞান পড়েছে বলেই যে সায়ন্তনী ধর্ম-টর্ম বিষয়ে অবিশ্বাসী, তা নয়। তাদের বাপের বাড়িতে সে ছোটবেলা থেকেই দেখেছে বামপন্থী আবহাওয়া। পুজোটুজোর কোনও চল নেই। ইদানীং সারা পৃথিবীতেই যে বিজ্ঞানের সঙ্গে ধর্ম এমনকী ঈশ্বরকে মেলাবারও একটা চেষ্টা হচ্ছে নতুন করে, তা সায়ন্তনী জানে। বড় বিজ্ঞানীরাও এক দিকে ডারউইনের বিবর্তনবাদ মানছেন আবার সৃষ্টিকর্তা হিসেবে ঈশ্বরকেও মেনে নিচ্ছেন। বাঙালি বিজ্ঞানী মণি ভৌমিক ‘কোড নেম গড’ নামে একটা বই-ই লিখে ফেলেছেন।

সায়ন্তনী এ সব নিয়ে কারও সঙ্গে তর্ক করে না। সে মনে মনে জানে, বিজ্ঞান কাকে বলে। যুক্তি, বুদ্ধি আর প্রমাণ দিয়ে যা নির্ণীত হয়, যা সিদ্ধ হয়, তাই-ই বিজ্ঞান। সেই প্রমাণ পাবার জন্যই তো লেবরেটরিতে এত এক্সপেরিমেন্ট করতে হয়। এর বাইরে থাকে বিশ্বাস, আবেগ, প্রথাগত ভক্তি। সেগুলোও তুচ্ছ নয়। মন্দির-মসজিদ-গির্জায় যাঁরা বুক ভরা বিশ্বাস নিয়ে প্রার্থনা করেন, তাঁরা মোটেই অশ্রদ্ধেয় নন, তেমনই ঈশ্বর কে বিজ্ঞানসিদ্ধ বলাটাও কোনও কাজের কথা নয়।

গাড়িটা বি টি রোড ধরে এসে শ্যামবাজার পার হল। একটা সাদা খোল, লাল পাড় শাড়ি পরে এসেছে সে, এই শাড়িটা তার মায়ের ব্যবহার কর া। বাড়িতে সিঁদুরের পাট নেই। কিন্তু লাল লিপস্টিক দিয়ে সিঁথির সিঁদুর আঁকা যায়, ঠোঁটের বদলে কপালে একটা লিপস্টিকের টিপ। তাকে বেশ ভক্তিমতী পুত্রবধূই দেখাচ্ছে।

গুরুদেবের বাড়ি কুমোরটুলি পাড়ায়। গঙ্গার ধারে। এটাই তাঁর পূর্ব পুরুষের বাড়ি, এখন আশ্রম। সে বাড়িতে পৌঁছবার আগে সায়ন্তনী মনে মনে দুটি সিদ্ধান্ত নিল। সেই মহাপুরুষটি হাত দেখে কিংবা কুষ্ঠি বিচার করে যা বলার তা বলুন। কিন্তু এর পরেও যদি তিনি যাত্রা-যজ্ঞ বা শুদ্ধিকরণের কিছু সুপারিশ করেন, তা সে কিছুতেই মানবে না। যথেষ্ট হয়েছে, ও সব ভড়ং তার সহ্য হবে না। আর একটি সিদ্ধান্ত, সে এখনই জানে, জ্যোতিষী কী বলবেন অরিজিৎ বিষয়ে। দেখা যাক সেটা মেলে কি না।

অরিজিতের মৃত্যুসংবাদ তিনি নিশ্চিত বলবেন না। কোনও বাবা-মায়ের সামনে বয়ঃপ্রাপ্ত সন্তানের মৃত্যুসংবাদ জানানোর মতন বুকের পাটা কোনও জ্যোতিষীর থাকে না। সুতরাং, তিনি ভেগোলজির আশ্রয় নেবেন। সায়ন্তনী অ্যাস্ট্রোনমির চর্চা করে, যা প্রমাণ-নির্ভর। আর অ্যাস্ট্রোলজি তার কাছে বুদ্ধিদীপ্ত আন্দাজ, মনস্তত্ত্ব কিংবা ল অব অ্যাভারেজের ব্যাপার। এই গুরুদেব হয় বলবেন যে, অরিজিতের অ্যা মনেশিয়া অর্থাৎ স্মৃতিনাশ হয়ে বাড়ির কথা সে ভুলে গেছে, অথবা তার কোনও শত্রুর ভয়ে সে আত্মগোপন করে আছে। বাড়িতেও কোনও খবর দিচ্ছে না, তার কারণ, সেই শত্রুপক্ষ বাড়ির ওপরেও নজর রাখছে, ইত্যাদি।

পুরনো আমলের বাড়ি, শ্বেতপাথরের সিঁড়ি, দোতলার ওপর মস্ত হলঘর । দু'এক পুরুষ আগে এই হলঘরটি ছিল হয়তো নাচঘর, এখন পরি বর্তিত ঠাকুরদালান, সব কোণে কালীমূর্তি। এই কালীর আবার চারটির বদলে ছ'টি হাত, এবং পায়ের তলায় শায়িত শিবঠাকুরও তাঁর স্ত্রীর মতনই উলঙ্গ। কোমরে বাঘছালও নেই। অনেক পারিবারিক মূর্তির এই রকম বৈচিত্র থাকে।

গুরুদেবটিকে দেখে প্রথমেই যে কারণে বিস্ময়বোধ জাগে, তা হল তার দেবকান্তি। এমন সুপুরুষ গুরুদেব বুঝি শুধু চলচ্চিত্রেই দেখা যায়। কিংবা তিনি যে কোনও চলচ্চিত্রের নায়কের থেকেও বেশি আকর্ষণীয়। ষাট-পঁয়ষট্টির মধ্যে বয়েস, গৌরবর্ণ, অত্যন্ত সুগঠিত শরীর, মাথায় বাবরি চুল, কিন্তু ঊর্ধ্বাঙ্গে কোনও পোশাক নেই। দেবীমূর্তির সামনে কোষাকুষি সাজিয়ে বসে আছেন, অথচ তাঁর হাতে জ্বলন্ত সিগারেট।

প্রথমে সামান্য আলাপের পর তিনি মুখ ঘুরিয়ে বসে ধ্যান করলেন ঠিক চল্লিশ মিনিট। ততক্ষণ বাবা, মা ও সায়ন্তনী একেবারে মুখ বুজে বসা। কথা বললে ধ্যানের ব্যাঘাত হবে, আবার উঠে যাওয়াও চলে না।

সায়ন্তনী ভাবল, ধ্যানের নিশ্চয়ই কিছু উপকারিতা আছে। তবে এই ধর নের হলঘরের চেয়ে গাছতলা বেশি উপযোগী। গৌতম বুদ্ধ একটা গাছে পিঠ ঠেকিয়ে তপস্যা করেছিলেন, সেই গাছ তাঁকে বোধি আয়ত্ত করতে সাহায্য করেছিল। ধ্যান শেষ করে গুরুদেব মা আর বাবার সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বললেন, অতি সাধারণ সব তথ্য। কত তারিখে জন্ম, কবে গ্র্যাজুয়েট, কত বয়েসে বিবাহ ইত্যাদি। তার পর সায়ন্তনীর দিকে ফিরে চুপ করে চেয়ে রইলেন ি মনিটখানেক। তাঁর বড় বড় চোখ, দীর্ঘ অক্ষিপল্লব। ইনি সিনেমায় নামেননি কেন?

এই ধরনের গুরুরা সাধারণত সব মেয়েদেরই মা বলে সম্বোধন করেন। এঁর সম্বোধন চমকপ্রদ। ইনি বললেন, খুকি, আমি তোমাকে দুটি মাত্র

প্রশ্ন করব। প্রথম প্রশ্ন, তুমি কি কখনও বুঝেছিলে যে তোমার স্বামী এক দিন হঠাৎ বাড়িঘর ছেড়ে চলে যাবে?

সায়ন্তনী বলল, না।

গুরুদেব বললেন, অত সংক্ষেপে বললে তো চলবে না। কোনও দিন কোনও আচরণে কিংবা ঘুমের মধ্যে কথা বলা শুনে, কিংবা যদি ডায়েরি থাকে, তা পড়ে, তোমার এ রকম মনে হয়নি?

বাবা আর মা পরস্পরের দিকে তাকালেন। তাঁরা তো জানেন, তাঁদের বউমাটি একাক্ষরা বা দু'অক্ষরা। অন্য মেয়ে হলে কলকল করে কত কথাই বলত।

এ বারেও সায়ন্তনী শুধু বলল, না।

গুরুদেব বললেন, বেশ। এই ছেলেটা, অরিজিৎ, কি মাঝে মাঝেই বেনারস যেত?

এ কথা শুনে সায়ন্তনী ভেতরে ভেতরে একটু কেঁপে উঠল। আবার বেনারস? কাকতালীয় নাকি?

গুরুদেব বললেন, খুকি, আমার কোনও অলৌকিক ক্ষমতা নেই। কুষ্ঠিবিচারও অভ্রান্ত হয় না। তবে আমার মনের মধ্যে মাঝে মাঝে একটা ফ্ল্যাশ হয়। ইউ মে কল ইট আ ভিশন। অরিজিতের বাবা, মা আর তোমার দিকে তাকিয়ে আমি অরিজিতের চেহারাটা মোটামুটি আন্দাজ করে নিলাম। তার পর, ধ্যান করছি, হঠাৎ দেখি, লাইক আ রিয়েলিস্টিক পিকচার, আই স অরিজিৎ। সে রয়েছে বেনারসে, বাঙালিটোলা দিয়ে হেঁটে হেঁটে সে যাচ্ছে দশাশ্বমেধ ঘাটের দিকে। ব্যস, এই পর্যন্ত।

সায়ন্তনী অভিভূতের মতন চেয়ে রইল গুরুদেবের দিকে। এটা সে আশাই করেনি। অনসূয়া নামে মেয়েটির টেলিফোনকে সে ভেবেছিল, অবান্তর। ইনিও বলছেন বেনারসের কথা? এইখানে বসে বেনারসের কোনও মানুষকে মনশ্চক্ষে দেখা যায়? এটা তো বিজ্ঞান নয়, প্যারাসাইকোলজি! সায়ন্তনী এটা বিশ্বাস করবে কী করে?

বাবা আর মা দু'জনেই উচ্ছ্বসিত। বলতে লাগলেন নানা কথা। সায়ন্তনীর একটু অপরাধবোধ হচ্ছে। সে অনসূয়ার টেলিফোনের কথা এঁদের জানায়নি। সেটা জানলে এঁরা অন্তত ভাবতে পারতেন, অরিজিৎ বেঁচে আছে। গুরুদেবও তো সেই কথাই বলছেন।

শেষকালে গুরুদেব বললেন, বেনারসে আর একটি আশ্রমের সঙ্গে তাঁর খুবই যোগাযোগ আছে। তাঁদের তিনি খবর পাঠাচ্ছেন, অরিজিতের খোঁজখবর করবে। আশা করি পাওয়া যাবে সুসংবাদ। বিদায় নেবার স ময়, শ্বশুর-শাশুড়ি এগিয়ে গেছেন, সায়ন্তনী মৃদু স্বরে গুরুদেবকে প্রশ্ন করলেন, আমি কি আপনার কাছে আর এক বার আসতে পারি? গুরুদেব তার পিঠে হাত রাখলেন। সেই স্পর্শে যেন বিদ্যুৎ। তিনি মধুর স্বরে বললেন, নিশ্চয়ই আসবে। তোমাকে তো আসতেই হবে! একা এসো।

অত্যাগসহন

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

সায়ন্তনী বিয়ের জন্য ব্যস্ত ছিল না, বরং বাবা-মাকে বার বার বলে দিয়েছিল, তাঁরা যেন সম্বন্ধ-টম্বন্ধ করে বিয়ে দেবার চেষ্টা না করেন। মায়ের মৃত্যুর পর বাবাও এ বাপারে উদাসীন হয়ে যান। অরিজিৎও মোটেই বিয়ে করে সংসারী হতে চায়নি এত তাড়াতাড়ি। সায়ন্তনীদের তুলনায় অরিজিৎদের পরিবার বেশ ট্র্যাডিশনাল। তার মায়ের ধারণা, ছেলে উপযুক্ত হয়েছে, মোটামুটি ভাল চাকরি করে। এখন বিয়ে না করার কী যুক্তি থাকতে পারে? বাড়িতে বউ আসবে, নাতি-নাতনি হবে, সেটাই তো সংসারের সার্থকতা। মেয়ের পক্ষে যে নাতি জন্মে গেছে, সেটা তিনি ধর্তব্যের মধ্যেই আনেন না। বংশরক্ষা কিংবা রক্তের ধারা বহমান রাখা বিষয়ে অনেকেরই ভুল ধারণা আছে। কটা পরিবারে তিন পুরুষ আগেকার কারও নাম মনে থাকে? মহাকাশ-সূত্রে ঘনিষ্ঠতা, এর পর কয়েক দিন অরিজিতের সঙ্গে মেলামেশার পর সায়ন্তনীর ধারণা হল, এ এক জন সম্পূর্ণ মানুষ। অর্থাৎ?

অরিজিতের চাকরিটাই ছবি আঁকার, যদিও বাণিজ্যিক কাজ করে, কিন্তু আঁকা তো শিখেছে রীতিমতন। তার আসল নেশা গানে। সে উচ্চাঙ্গ সংগীত এবং রবীন্দ্র সংগীত, দুটোরই চর্চা করে, গলায় বেশ সুর আছে। প্রতি দিন গান নিয়ে কিছুক্ষণ সময় কাটাবেই। এক সময় খেলাধুলোরও চর্চা করেছে অরিজিৎ, তার মা যত্ন করে কয়েকটা পুরস্কারের কাপ সাজিয়ে রেখেছেন আলমারিতে। এখনও সে মাঝে মাঝে ব্যাডমিন্টন খেলে। নানা রকম বইও পড়ে নিয়মিত। মুখস্থ বলতে পারে অনেক কবিতা। সায়ন্তনীও বাচ্চাবেলা থেকেই গল্পের বই পড়তে ভালবাসে। কিন্তু কবিতা বিশেষ পড়েনি। অরিজিৎ প্রায়ই বলে, কবিতা না পড়লে জীবনটাই ঠিকমত উপভোগ করা যায় না।

এবং তার আছে মহাকাশ সম্পর্কে আগ্রহ। পপুলার সায়েন্সের বেশ কিছু বই সে পড়েছে। বিগ ব্যাং থিয়োরি নিয়ে আলোচনা করতে পারে। কোটি কোটি অর্বুদ নিযুত সংখ্যক গ্রহ-নক্ষত্র, উপগ্রহ-উল্কা ইত্যাদি নিয়ে যে এই মহাশূন্য, তা যে এখনও প্রসারিত হচ্ছে, এ নিয়ে তার বিস্ময়ের শেষ নেই। প্রথম বিবাহ-বার্ষিকীতে সে সায়ন্তনীকে শাড়ি বা গয়না উপহার দেয়নি, দিয়েছিল স্টিফেন হকিং-এর 'ব্রিফ হিস্ট্রি অফ টাই ম' অবলম্বনে যে একটা সিনেমা হয়েছে, তার সি-ডি।

অর্থাৎ জাগতিক এবং মহাজাগতিক, সব কিছু সম্পর্কেই তার খুব উৎসাহ। মানুষের সভ্যতা যা যা সৃষ্টি করতে করতে এগোচ্ছে, তার কিছু থেকেই সে দূরে থাকতে চায় না। অনেক ভাল বিজ্ঞানী কিংবা অর্থনীতিবিদ, কিন্তু সাহিত্যের কিছুই বোঝে না। নামকরা খেলোয়াড় কিন্তু গান-বাজনার সময় ছটফট করে, এরা সম্পূর্ণ মানুষ নয়।

অরিজিতের আর একটা বড় গুণ, তার দেখানেপনা নেই। গানের ব্যাপারে সে অনেক মঞ্চ-গায়কের চেয়ে বেশি সার্থক। কিন্তু সে কোনও দিন মঞ্চে ওঠেনি। এত কবিতা মুখস্থ, তবু কবিতা লেখে না নিজে। এ সব কিছুই তার নিজের উপভোগের জন্য, খ্যাতির প্রতি কোনও মোহ নেই তার। অথচ তাকে ঠিক নিরাসক্তও বলা চলে না। বাইরের লোকদের সঙ্গে বেশি না মিশলেও সায়ন্তনীর সঙ্গে অনেক রাত জেগে গল্প করেছে। আমাদের সংগীতে সাতটি শুদ্ধ স্বর আর পাঁচটি কোমল। এর কোথায় কী রকম ব্যবহার হয়, এক-দু'লাইন করে গান গেয়ে গেয়ে যখন বুঝিয়েছে অরিজিৎ, মুগ্ধ হয়ে শুনেছে সায়ন্তনী। তার বাপের বাড়িতে রাজনীতির চর্চা ছিল বেশি, গান-বাজনার পরিবেশ ছিল না।

রাত প্রায় সাড়ে এগারোটা, জানলার কাছে দাঁড়িয়ে আছে সায়ন্তনী। একটা নীল রঙের পাতলা রাত পোশাক পরা। মুখে ক্রিম মাখছে, দৃষ্টি অতি সুদূর। আজ সকাল থেকেই সে ভাবছে, এ বার একটা কিছু সিদ্ধান্ত নিতে হবে। সাড়ে চার মাস হয়ে গেল। অরিজিতের কোনও সন্ধান নেই। সে জীবিত না মৃত, তাও জানা যায়নি। সায়ন্তনী এই ভাবে আর কত দিন থাকবে?

পুকুরের ও-পাশে একটা তালগাছে কুক্ কুক্ করে একটা পাখি ডাকছে। এই মফস্‌সলে বিয়ের পর এসেই সে প্রথম রাতপাখির ডাক শুনছে। মনোহর পুকুর যদিও তার বাপের বাড়ির রাস্তার নাম, সেখানে কোনও

পুকুর নেই। রাতপাখিও নেই। সেখানেই জীবনের প্রথম ছাব্বিশটা বছর কাটিয়েছে সায়ন্তনী।

ঝনঝন করে বেজে উঠল টেলিফোন। বেশি রাত্রির নিস্তব্ধতায় ফোনের আওয়াজটাও বেশি জোর মনে হয়। আশঙ্কা হয়, বুঝি কোনও দুঃসংবাদ, কিংবা কেউ ব্যাকুল ভাবে কিছু জানাতে চাইছে।

ফোনটা তুলে সায়ন্তনী বলল, হ্যালো।
ও দিক থেকে কোনও সাড়া নেই।
দু'তিন বার হ্যালো বলল সায়ন্তনী। লাইন কাটেনি, যেন কারও নিঃশ্বাসের শব্দও শোনা যাচ্ছে। কিন্তু কোনও কথা বলছে না।
কয়েক দিন আগেও এ রকম হয়েছে এক বার।
প্রথমে তো মনে হবেই যে অরিজিতের ফোন। কিন্তু সায়ন্তনীর গলা শুনেও সে উত্তর দেবে না কেন?

তা হলে অন্য কেউ? কোনও বদ লোক? এ রকম তো মানুষ আছেই, যারা বেনামি চিঠিতে কুৎসা করে, ফোনে কদর্য কথা বলে। তাতে তারা কী আনন্দ পায় কে জানে!

ফোনটা রেখে দেবার একটু পরেই আবার বাজল। সায়ন্তনী এ বার রিসিভারটা তুলে নিজে কিছু বলল না, কানে লাগিয়ে রাখল, যদি ও দিক থেকে কিছু কথা আসে। এমন তো হতেই পারে, এক জন কেউ চেষ্টা করছে কিন্তু ঠিক মতন কানেকশান পাচ্ছে না। বিদেশের ফোনে হতে পারে। মোবাইল ফোন থেকেও এ রকম হয়। এ বারেও শুধু নিস্তব্ধতার মধ্যে মৃদু নিঃশ্বাসের শব্দ। ফোনটা রেখে দিতেই দরজায় টক টক শব্দ। পাতলা পোশাকের ওপর হাউস কোটটা জড়িয়ে নিয়ে সায়ন্তনী দরজা

খুলল। অবাক হল না।

বাড়ির অন্য সবাই এর মধ্যে ঘুমিয়ে পড়লেও অভিজিৎ অনেক রাত জেগে পড়াশুনো করে কিংবা লেখে। মাঝে মাঝে রাত চারটে-সাড়ে চার টের সময়ও জেগে উঠে সায়ন্তনী অভিজিতের ঘরে আলো জ্বলতে দেখেছে।

অভিজিতের হাতে জ্বলন্ত সিগারেট। সে জিজ্ঞেস করল, বউদি, কেউ টেলিফোন করেছিল?
সায়ন্তনী বলল, না।
অভিজিতের চোখে চাপা বিস্ময়।
সায়ন্তনী আবার বলল, দু'বার টেলিফোন বেজেছে, কিন্তু কারও কথা শোনা যায়নি।
অভিজিৎ তবু সায়ন্তনীর দিকে চেয়ে রইল।
সায়ন্তনী জিজ্ঞেস করল, তবে কি তোমার কোনও গার্ল ফ্রেন্ড? আমার গলা পেয়ে....

অভিজিৎ বলল, মাঝ রাত্তিরে ফোন করার মতন আমার কোনও মেয়েবন্ধু এখনও জোটেনি। যদি জুটত, এখনকার মেয়েরা অন্য কারও গলা পেয়ে লাইন কেটে দেয় না। সোজা বলে, আমার বয় ফ্রেন্ডকে একটু ডেকে দিন তো। সায়ন্তনী বলল, সেটাই স্বাভাবিক। অভিজিৎ জিজ্ঞেস করল, বউদি, তোমার ঘরে এসে একটু বসব? আগে রাত্তির বেলা মাঝে মাঝে দাদার একটু আধটু গান শুনতে পেতাম, সেটা খুব মিস করি। ভেতরে ঢুকে সে সিগারেটের ছাই ফেলার জন্য এ দিক-ও দিক তাকাতেই সায়ন্তনী তার দিকে একটা অ্যাশট্রে এগিয়ে দিল। একটা লম্বা সোফায় বসে পড়ে সে বলল, প্রবলেমটা কী জান, আমার দাদাটা বড্ড বেশি পারফেক্ট। কোনও খুঁত নেই। ছেলেবেলা থেকেই শুনে আসছি, অরিজিৎ খুব ভাল ছেলে, আইডিয়াল সান, আইডিয়াল ম্যান, এমনকী আইডিয়াল হাজব্যান্ড! তাই না?

সায়ন্তনী বলল, পারফেক্ট হওয়া কি দোষের? মানুষ তো তাই হবারই চেষ্টা করে।

ভুল! সব মানুষের মধ্যেই একটু না একটু পাগলামি থাকা দরকার।

তাতে ব্যালান্স হয়। নইলে, পারফেক্ট হবার ভূমিকা পালন করতে কর
তে এক দিন হঠাৎ তার মাথার নাটবল্টু আলগা হয়ে যায়। দাদারও তাই
হয়েছে নিশ্চিত। যে মানুষ মাঝে মাঝে ভুল করে না, সে পার
ফেকশানেরও সঠিক মূল্য বোঝে না। তাই না?
এটা তোমার ফিলোজফি। আমি রিজ্‌ন বুঝি। ফিলোজফি ঠিক বুঝি না।

শোনো হে ফিজিক্স নন্দিনী। দর্শন হচ্ছে তোমাদের সব বিজ্ঞানের
বাবা। দার্শনিকরা আগে জীবন ও জগৎ সম্পর্কে নতুন কিছু চিন্তা করেন,
বিজ্ঞান তার কিছু কিছু বলে। যাক গে ও সব কথা। দাদা এই যে হাওয়া
হয়ে গেল, সে সম্পর্কে তোমার থিয়োরিটা কী? সেটাই শোনা হয়নি।
তুমি তো কিছুই বলতে চাও না। আমাকে অন্তত বলো।
আমার তো কোনও থিয়োরি নেই।

তুমিও আমাদের মতনই বিউইলডারড? সত্যি কিছুই মাথামুণ্ডু বোঝা
যাচ্ছে না! হোয়াট অ্যাবাউট বেনারস? এক গুরুঠাকুর নাকি স্বপ্নে
দেখেছেন, দাদা কাশীর গলিতে ঘাপটি মেরে রয়েছে?
স্বপ্নে না, জেগে জেগে দেখেছেন। ভিশান। আমি ঠিক বিশ্বাস করতে
পারিনি।
কেন? তিনি খুব ফেমাস জ্যোতিষী শুনেছি। পয়সার খাঁই নেই। তিনি ি
মথ্যে কথা বলবেন কেন? আর মানুষ তো ভিশান দেখেই। আমিও
দেখি। প্রায়ই দেখি।

সে তোমরা লেখকরা....। ইনি তোমার দাদাকে কখনও চোখে দেখেননি,
আগে কোনও ছবিও দেখেননি, তবু ইনি কী করে যোগবলে দেখে
ফেললেন, সেই মানুষটাই বেনারসের বাঙালিটোলায় ঘুরে বেড়াচ্ছে?
অ্যাবসার্ড। আমার পক্ষে বিশ্বাস করা অসম্ভব।

তবু উনি বললেন কেন? জোক্স?
হয়তো পুরোটা নয়। শুধু বেনারস নামটা বলার মধ্যে কিছুটা সত্যতা
থাকতেও পারে।
কী করে?
কোনও কোনও মানুষের নাকি এই ক্ষমতা থাকে, কারও মুখের দিকে
তাকিয়ে সে সেই মুহূর্তে কী চিন্তা করছে, তা বুঝতে পারে। প্যারা
সাইকোলজিতে এ রকম আছে।
আর একটু ব্যাখ্যা করো, বউদি। ঠিক মাথায় ঢুকছে না।
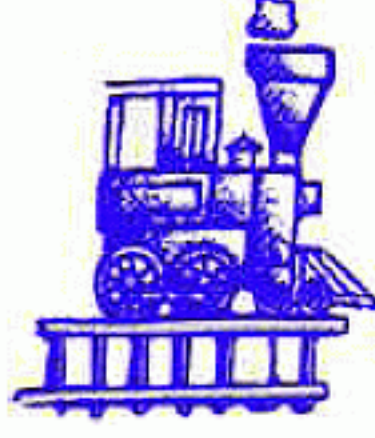
ওই গুরুদেব অনেকক্ষণ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। ঠিক সেই সময় আমি বেনারসের কথাই ভাবছিলাম। উনি আমার ভাবনাটা আমার মুখ দেখে পড়ে ফেললেন। এটা কী করে হয় আমি জানি না। তবে, কেউ কেউ নাকি পারে।
মাই ডিয়ার বউদি, তুমি কেন সেই মুহূর্তে বেনারসের কথা ভাবছিলে? সেটা তোমায় বলব না। মানুষ তো যখন-তখন নানান জিনিসের চিন্তা করে। সব কিছুর কি ব্যাখ্যা থাকে?

দ্যাটস রাইট। মাঝে মাঝে কোনও একটা গান যে কোথা থেকে উড়ে এসে জুড়ে বসে মাথায়, তার কি কোনও ব্যাখ্যা আছে? আজ আমি সার াদিন ধরে মনে মনে গাইছি, 'যেতে যদি হয় হবে হবে হবে গো, যাবো যাবো যাবো তবে....'। এর কোনও মানে আছে? আমি তো কোথাও যেতে-ফেতে চাই না!

উঠে দাঁড়িয়ে সে বলল, তুমি এখন একাকিনী বিরহিনী, আই মাস্ট লিভ ইউ অ্যালোন। শুধু আর একটা কথা বলব বলব ভাবছি, বলা উচিত কি না জানি না।
বলে ফেলো। তুমি আজ ড্রিঙ্ক করেছ, তাই না অভি?

ঠিক ধরেছ। বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে মাঝে মাঝেই। এখন দেরি করে ফিরলে মা এমন হেঁচকি উঠিয়ে ফেলে, তাই নিজের ঘরে দরজা বন্ধ করে একটু ঢুকু ঢুকু। প্রবলেম হচ্ছে, আমার আজ স্টক শেষ। একটা কিছু লেখার চেষ্টা করছি, আর একটু না হলে....দাদার কোনও বোতল-টোতল স্টকে আছে নাকি গো? দাদা ফিরে আসার আগেই আমি শোধ করে দেব।

আলমারি খুলে সায়ন্তনী বলল, খানিকটা রাম আছে দেখছি। তুমি রা ম খাও!
উল্লসিত ভাবে অভিজিৎ বলল, আমি তো দাদারই ভাই। রামভক্ত হনু মান। দাও, দাও!
অভিজিৎ চলে যাবার পর সায়ন্তনী ওপরের জামাটা খুলে ফেলল। তার

পরেই তার মনে হল, আজ যেমন সে অভিজিৎকে রাম-এর বোতলটা তুলে দিল, সেই রকমই অরিজিতের অনেক জামা-প্যান্ট যে এখানে-সেখানে ছড়িয়ে আছে। সেগুলোও এক দিন কারওকে না কারওকে দিয়ে যেতে হবে। সে সব অভিজিতের গায়ে লাগবে না। সে দাদার তুলনায় কিছুটা বেঁটে। অনেক ভিখিরি এগুলো পেলে দু'হাত তুলে আশীর্বাদ করবে।

অনেক রাত পর্যন্ত সায়ন্তনীর ঘুম এল না। রাতপাখিটা ডেকেই চলেছে। প্রায় শেষ রাতে এক বার বাথরুমে যেতে গিয়ে দেখল, আলো জ্বলছে অভিজিতের ঘরে। খুব বেশি রাম তো ছিল না, এতক্ষণ কী করছে সে? কুমোরটুলির সেই গুরুদেবের সঙ্গে আর দেখা করতে যায়নি সায়ন্তনী। তিনি নিজেই এক দিন চলে এসেছিলেন এ বাড়িতে।

সায়ন্তনী মুখে কিছু বলেনি। কিন্তু ভেতরে ভেতরে তার বেশ হাসি পেয়েছিল। গুরুদেব নামে পরি চিত এই ব্যক্তিটি আসলে বেশ মজার। ইনি ধরেই নিয়েছেন যে, তাঁর এত সুপুরুষ চেহারা, তাঁকে দেখে স্বামী-বঞ্চিত এক নারী আকৃষ্ট হবেই।

তিনি বলেছিলেন, তুই আর এলি না কেন খুকি? ভেবেছিলাম, তোকে সামনে বসিয়ে আমি আর এক বার ধ্যান করব। যদি তাকে আবার দেখতে পাই।
মা বললেন, আপনি কষ্ট করে নিজে এসেছেন, এ যে আমাদের কত বড় সৌভাগ্য। আমরা ধন্য হয়ে গেছি। আপনি যা বললেন, তা এখানে হয় না?

সায়ন্তনী সঙ্গে সঙ্গে ঠিক করে ফেলেছিল, সে কিছুতেই আর বেনারসের কথা ভাববে না। সে চিন্তা করবে দার্জিলিং-এর কথা। মলের দোকানপাট, পটভূমিকায় কাঞ্চনজঙ্ঘা খুব স্পষ্ট, রোদ লেগে ঝক ঝক করছে....। দেখা যাক, গুরুদেবের কতটা ক্ষমতা।

কিন্তু গুরুদেব তাতে রাজি না হয়ে প্রবল বেগে মাথা নেড়ে বলেছিলেন, না না, যে কোনও জায়গায় কি মনঃসংযোগ করা যায়? তার জন্য পরি বেশ লাগে। আমার নিজস্ব আসনটার ওপর বসলেই যেন আমার ওপর

কিছু একটা ভর করে। ও যেতে পারবে না আমার কাছে? অবশ্য, আমি এর মধ্যে গণনা করে দেখেছি, শ্রীমান অরিজিতের আয়ু আছে অনেক দিন। আছে সে কোথাও না কোথাও।

তা শুনেই মা দারুণ পুলকিত হয়ে সায়ন্তনী কিছু বলার আগেই বলে দিলেন, হ্যাঁ হ্যাঁ, যেতে পারবে না কেন? নিশ্চয়ই যাবে। সায়ন্তনীও লক্ষ্মী মেয়ের মতন মাথা ঝুঁকিয়ে বলেছিল, হ্যাঁ যাব। কিন্তু সে যায়নি। নানান ছুতোয় এড়িয়ে যাচ্ছে।

একা একা দেখা করতে গেলেও গুরুদেব তো তাকে খেয়ে ফেলতে পারবেন না, সে মনের জোর আছে সায়ন্তনীর। উনি জোর-জবরদস্তিও করবেন না, ঠিক সেই ধরনের রুক্ষ মানুষ নন। খানিকটা আপাত সম্ভ্রম রাখার ব্যাপার আছে।

তবে কিছু কিছু মানুষ থাকে, যারা একান্তে মেয়েদের শরীর চক্ষু-লেহন করেই আনন্দ পায়। হাত দিয়ে ছোঁয় না। কিন্তু দৃষ্টিতে থাকে অনেক বেশি লুব্ধতা। মেয়েরা সেই দৃষ্টি চেনে। সব মেয়েকেই কখনও না কখনও এই দৃষ্টি সহ্য করতে হয়। সায়ন্তনী সহ্য করতে পারে না। তার গা ঘিনঘিন করে।

অন্যান্য চেনাশুনো মানুষদেরও দৃষ্টির পরিবর্তন লক্ষ করছে সায়ন্তনী। এত দিন তার একটা আলাদা পরিচয় থাকলেও সে ছিল অরিজিতের স্ত্রী। ছ'মাস হয়ে গেল, এখন এই পরিচয়টা মুছে যাচ্ছে। সে একা। যাকে বলে সিঙ্গল উয়োম্যান। এই সিঙ্গল উয়োম্যানদের সম্পর্কে অনেকেরই ধারণা, এরা সহজ-লভ্য। ছ'মাসের বেশি যে নারী স্বামীসঙ্গ বঞ্চিত, তার নিশ্চয়ই শরীরের ক্ষুধা আছে। সেই ক্ষুধা মিটিয়ে দেবার জন্য অনেকেই উদগ্রীব।

বিয়ে করতে হবে না, কোনও দায়িত্ব নিতে হবে না, শুধু খানিকটা শরীরের খেলার মজা। যাদের ব্যবহারে এ-রকম সামান্য ইঙ্গিতও থাকে, তাদের সঙ্গে কথা বলা বন্ধ করে দিয়েছে সায়ন্তনী। বাড়ির পরিবেশটাও বদলে গেল আস্তে আস্তে। অরিজিতের মা তাকে খুবই ভালবেসেছিলেন, এমনকী নিজের মেয়ের চেয়েও বেশি। এখন মাঝে মাঝেই তিনি কেমন যেন অদ্ভুত চোখে তাকিয়ে থাকেন সায়ন্তনীর

দিকে। মুখে কিছু বলেন না। কিন্তু সম্ভবত তাঁর বদ্ধমূল ধারণা হয়েছে, পুত্রবধূটির কোনও ব্যবহারের জন্যই পুত্র গৃহত্যাগী হয়েছে। তা ছাড়া আর কোনও কারণ তো পাওয়া যাচ্ছে না। গুরুদেব ধ্যানযোগে ভেতরের কথা টেনে আনতে পারতেন, তাই সে যেতে চায় না তাঁর কাছে। আর অনেকক্ষণ সে বাড়ির বাইরে থাকে কলেজে পড়াবার ছুতোয়। তখন সে অন্য কোনও পুরুষের সঙ্গে নট-ঘট করে কি না কে জানে!

শাশুড়ির এই মনোভাব ঠিকই অনুভব করতে পারে সায়ন্তনী। এ রকম একটা সন্দেহের বাতাবরণের মধ্যে থাকতে সায়ন্তনীর এখন গায়ে জ্বালা ধরে। একটা কিছু সিদ্ধান্ত নিতেই হবে। বাপের বাড়িতে গিয়ে থাকবে কিছু দিন? সেখানে এখন দাদা-বউদির সংসার, তাদের তিন ছেলে-মেয়ে। সে মণিদীপার মতন ও বাড়িতে গিয়ে নিজের অংশ দাবি করতে পারবে না। বাবাও তো এর মধ্যে এক বারও বলেননি, ও বাড়িতে গিয়ে থাকতে! একলা কোথাও আলাদা থাকার যোগ্যতা আছে সায়ন্তনীর।

সকালবেলা বাড়ির কাজের মেয়েটি এসে ঘর মোছার জন্য ন্যাতার কাপড় চাইল। আলমারি খুলে কোনও পুরনো কাপড়-টাপড় খুঁজতে গিয়ে সায়ন্তনীর চোখে পড়ল কয়েক বছর আগে কেনা একটা জামা। কাঁধের কাছে খানিকটা পিঁজে গেছে। সেই জামাটাই দিয়ে দিল মেয়েটিকে।

পর মুহূর্তেই তার বুকটা ধক করে উঠল, এটা অরিজিতের খুব প্রিয় জামা। পরতো প্রায়ই। সেই জামাটা....তবে কি সায়ন্তনীর অবচেতনেও ধারণা জন্মে গেছে যে অরিজিৎ আর কোনও দিনই ফিরে আসবে না? না না, সায়ন্তনী এখনও অরিজিৎকে ভালবাসে।

অত্যাগসহন

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

লেখাটা চলছে। তার মাঝখানে লেখকের স্ত্রী হঠাৎ ঘরে ঢুকে প্রায় কাব্যের ভাষাতেই বললেন, বৃষ্টি, বৃষ্টি, খালি বৃষ্টি। তিন দিন একটানা, তার পর যদি বা রোদ উঠল, আবার দেখেছ, আকাশ কালো হয়ে এসেছে।

লেখক আকাশ দেখলেন না। মুখ না তুলেই বললেন, হুঁ!
এ বারে তাঁর স্ত্রী গদ্যভাষায় বললেন, মাথা গুঁজে কী লিখে যাচ্ছ দিনের পর দিন? এখনও লেখা শেষ হল না?
লেখক অন্যমনস্ক ভাবে বললেন, আর একটু বাকি।
সহধর্মিণী বললেন, সব শারদীয় সংখ্যা তো বের হয়ে গেল, এখনও আবার এত লেখা কীসের? কী নিয়ে লিখছ?
আমি বললাম, কী নিয়ে লিখছি, তা বলা শক্ত। আগে যা লিখিনি, তেমনই একটা কিছু।
স্বাতী জিজ্ঞেস করল, প্রেমের গল্প?
আমি বললাম, অপ্রেমের নয় নিশ্চয়ই। প্রেমের খোঁজাখুঁজির ব্যাপার আছে।
কতটা লিখেছ, দাও তো পড়ে দেখি।
এখানে বসে পড়বে? পাশের ঘরে যাও। সামনে বসে কেউ পড়লে আমার অস্বস্তি লাগে।

কিন্তু এই রমণী বড়ই অস্থির স্বভাবের। এক জায়গায় বেশিক্ষণ বসতে পারে না। কয়েক বারই উঠে গেল, বসবার ঘরে কিংবা রান্নাঘরে, বাথরুমে। এক বার আমাকে বলে গেল, বাড়িতে সর্বক্ষণ লোক আসছে, ছুটি পড়ে গেছে। এর মধ্যে কি নিশ্চিন্তে বসে কিছু পড়বার উপায় আছে?

যেন বাড়িতে লোকজন আসার জন্য আমিই দোষী। যারা আসছে, তারা

কেউ-ই আমার জন্য নয়। মৃদু ভাবে বললাম, এখন পড়তে হবে না। পরে কোনও সময়....

আবার খানিকবাদে স্বাতী এসে রীতিমত মুখ ঝামটা দিয়ে বলল, তোমার এই ছাইভস্ম লেখাটা পড়তে গিয়ে আমার কত সময় নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। বিদেশে যেতে হবে, কত কাজ বাকি।
এ বার আমি সহাস্যে বললাম, এই ছাইভস্ম লেখাটা পড়বার জন্য কে তোমায় মাথার দিব্যি দিয়েছে? পড়তে হবে না, ফেরত দাও। স্বাতী তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে বলল, তোমার লেখার একটা বাজে দোষ হচ্ছে, এক বার পড়তে শুরু করলে শেষ না করে পারা যায় না। গর্ব করার একটা সুযোগ পেয়ে তা না ছেড়ে আমি বললাম, এই বাজে দোষটাকেই অনেকে মহৎ গুণ বলে!

একটা চেয়ার টেনে বসে পড়ে সে বলল, যারা ওই কথা বলে, তারা সাহিত্যের কিচ্ছু বোঝে না। তুমি এই অরিজিৎ ছেলেটিকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত কী করবে ভেবেছ? মেরে ফেলবে নাকি?
না, না। মেরে ফেলব কেন? আমি খুন-টুন একেবারে পছন্দ করি না। লেখার মধ্যে কত যে খুন করো, তার কি ইয়ত্তা আছে! তোমরা লেখকর া যখন যাকে ইচ্ছে মেরে ফেলতে পারো। কিংবা বিনা কারণে হারিয়ে যায়।

লেখকরা ইচ্ছে করলেই তা পারে না। গল্প-উপন্যাসের চরিত্রগুলো কাল্পনিক হলেও জীবন্তও বটে। তাদের অস্তিত্বের একটা লজিক থাকে। সেই লজিক বা ঔচিত্যবোধের বাইরে তাদের নিয়ে যা খুশি করা যায় না।

গল্প-উপন্যাসের চরিত্ররা কি মরে না?
মরবে না কেন? শোনো, এ বিষয়ে বেশ চমৎকার একটা গল্প আছে।
স্বাতী উঠে দাঁড়িয়ে বলল, থাক, অন্য গল্প শোনার আমার সময় নেই। তুমি সায়ন্তনী নামের মেয়েটাকে এমন একটা বাজে অবস্থায় ফেলেছ....

আমি জোর করে স্বাতীকে বসিয়ে দিয়ে বললাম, শোনো, শোনো, এই গল্পটা শোনো। এক সময় 'ভারতবর্ষ' নামে খুব বিখ্যাত একটা মাসিক পত্রিকা ছিল। তার সম্পাদক জলধর সেন। তিনি ছিলেন শরৎচন্দ্রের খুব বন্ধু। এই জলধর সেন নিজেও কিছু গল্প-উপন্যাস-ভ্রমণকাহিনি লিখেছিলেন। এক দিন তিনি তাঁর লেখা একটা নতুন গল্প শরৎচন্দ্রকে পড়ে শোনাচ্ছিলেন। শরৎচন্দ্র তামাক খেতে খেতে শুনছিলেন। গল্পে দু'জন নায়ক আর একটি নায়িকা। এক জায়গায় হঠাৎ এক জন নায়ক সাপের কামড়ে মারা গেল। শরৎচন্দ্র অমনি বাধা দিয়ে বললেন, ও কী, ও কী, জলধর, তুমি ছেলেটাকে সাপের কামড় খাইয়ে হঠাৎ মারলে কেন? জলধর সেন বললেন, কেন, সাপ কি মানুষকে কামড়ায় না? তাতে মানুষ মরে না? শরৎচন্দ্র তখন হেসে বললেন, হ্যাঁ, সাপ অবশ্যই মানুষকে কামড়ায়। কিন্তু কোনও লেখককে সাহায্য করার জন্য কামড়ায় না!— এই বার বুঝলে, একেই বলে ঔচিত্যবোধ।

স্বাতী ভুরু কুঁচকে বলল, তুমি অরিজিৎকে এমন ভাবে অদৃশ্য করে দিয়েছ, তার ফিরে আসার আর তো কোনও রাস্তাই খোলা নেই। সে অ্যাকসিডেন্টে মারা যায়নি, কেউ ধরে রাখেনি, সাধু-সন্ন্যাসী হয়নি, জেলে যায়নি, তা হলে সে কোথায় আর কেন কত দিন ঘাপটি মেরে থাকবে? এক বার বেনারসের কথা উল্লেখ করেও আবার মুছে দিলে। বেনারসে তার সঙ্গে কি অন্য কোনও মেয়ে ছিল?
জানি না।
সে রকম একটা ইঙ্গিত আছে। যাই হোক, ও আর ফিরবে কী করে? কোনও পথই তো নেই।

একটা পথ এখনও খোলা আছে। অ্যামনেশিয়া। হঠাৎ স্মৃতি নষ্ট হয়ে যায়। ধরো, সে দিন অফিস থেকে বেরিয়ে শিয়ালদা স্টেশনের বদলে ও চলে গেল হাওড়া স্টেশনে। বাড়ির কথা একেবারে ভুলে গিয়ে অন্য কোথাও শুরু করল আলাদা একটা জীবন। আবার এক সময় সব যদি মনে পড়ে যায়.... ধ্যাৎ! হিন্দি

সিনেমায় এ সব হয়। আগেকার হলিউডের ফিল্মেও এ রকম গল্প হত। মনে নেই, র‍্যানডম হারভেস্ট! যাই হোক, আমি এই ধরনের অস্বাভাবিক ব্যাপার-স্যাপার আমার গল্পে ব্যবহার করি না। আসলে আমি সায়ন্তনীর ওপরেই জোর দিতে চেয়েছিলাম। অরিজিৎ না হয় হারিয়ে গেছে, কিন্তু সায়ন্তনী তো রয়েছে একই জায়গায়। নানা লোকের মাঝখানে, তবু সে কী রক ম নিঃসঙ্গ হয়ে যাচ্ছে আস্তে আস্তে। ট্র্যাজেডি তো সেইখানেই।

দেওরের সঙ্গে যেন ওর প্রেম করিয়ে দিও না।
আরে না, না। দেওর-বউদির প্রেম তো অতি হ্যাকনিড ব্যাপার। ওই সব বিষয় আমি অন্যদের জন্য ছেড়ে দিয়েছি।

নিজের স্ত্রীর কাছে যে একটু গর্ব করব, তার উপায় নেই। স্বাতী আমার সব লেখারই অতি কড়া সমালোচক। প্রশংসা করেই না বলতে গেলে। কাগজগুলো টেবিলের ওপর রেখে বলল, এই নাও, তোমার যা খুশি করো।

আমি সাদা প্যাডের দিকে তাকিয়ে অরিজিৎকে দেখার চেষ্টা করলাম। আর আমি দেখতে পেলাম সায়ন্তনীকে। একেবারে স্পষ্ট। এটাই অনেককে বোঝানো যায় না, যে লেখক চাইলেই কোনও চরিত্রকে দিয়ে যে-কোনও কাজ করাতে পারে না। তাদেরও ইচ্ছে-অনিচ্ছের ব্যাপার থাকে। তারা অনেক সময় তাদের নিজস্ব পথে লেখককে নিয়ে যেতে বাধ্য করে।

কলেজ ছুটির পর সোজাসুজি বাড়ি ফিরছে না সায়ন্তনী। সে উল্টো দিকের বাসে উঠেছে। স্বস্তিকা আজ আসেনি, হেড অব দি ডিপার্টমেন্টকে ফোনে জানিয়েছে, তার শরীর ভাল নয়। শনিবার তার একটু জ্বর জ্বর ভাব ছিল।

বাসে যথারীতি খুব ভিড়। কোনও সময়েই তো বাস ফাঁকা থাকে না, এমনকী দুপুরেও। বসবার জায়গা না পেলে ব্যক্তিত্ব নষ্ট হয়ে যায়। কারণ, একটা হাত তুলে থাকতে হয়। পা টলমল করে, তার মধ্যেই আবার কোনও বদরসিক পুরুষ অসঙ্গত আচরণ না করে,

সজাগ থাকতে হয় তার জন্য। এই সময়টায় সুন্দরী মেয়েদেরও সুন্দর দেখায় না। ভুরু কুঁচকে থাকে। টিকিট কাটার সময় টাকা বার করতে গিয়ে সায়ন্তনীর ছোট পার্স থেকে একটা কুড়ি টাকার নোট পড়ে গেল। নিচু

হয়ে কুড়োতে হবে, তার আগেই একটা পনেরো- ষোলো বছরের কিশোর সেটা তুলে দিতেই সায়ন্তনীর মন কিছুটা ভাল হয়ে গেল। ভুরু সোজা করে সে ছেলেটির দিকে তাকিয়ে হাসল। এ রকম অযাচিত সাহায্যের সুখের স্বাদই আলাদা।

শ্যামবাজারে বাস বদল করতে হবে। এর মধ্যে কেউ সিট ছাড়েনি, পুরোটাই দাঁড়িয়ে। শ্যামবাজারের পাঁচ মাথার মোড় দিশেহারা হবার মতন জায়গা। সব সময়ই রাস্তা পেরুনো মনে হয় বিপজ্জনক। সায়ন্তনী সাবধানে দুটো রাস্তা পার হয়ে এ বার উঠল ট্রামে। ইস্, এ বারেও বসবার জায়গা পেল না। হাতিবাগান বাজারের পাশ দিয়ে ট্রামটা বেঁকে গেল ঋষি অরবিন্দ সরণিতে। এখনও কেউ কেউ বলে গ্রে স্ট্রিট।

যেখানে সে নামল, তার উল্টো দিকের গলি দিয়ে শোভাবাজার রাজবাড়ির দিকে যাওয়া যায়। উত্তর কলকাতায় বেশি আসা হয় না। তবু এই পথটা সায়ন্তনীর চেনা। রাজবাড়ির একটু আগেই একটা পুরনো আমলের দোতলা বাড়ি, ওপরের বারান্দাটার ঝুরঝুরে অবস্থা।

একতলার সব ঘর ভাড়া দেওয়া। মাঝখানের উঠোনে দু'জন রমণীর ব্যাঁকা ব্যাঁকা ভাষায় ঝগড়া চলছে। সিঁড়ি দিয়ে সায়ন্তনী উঠতে লাগল ওপরে। বন্ধ দরজাটার সামনে দাঁড়াতেই বিদ্যুৎ চমকের মতন তার মনে পড়ল, আজ একুশে অগস্ট, আজ তো স্বস্তিকার জন্মদিন। ছি ছি, এটা মনে পড়েনি সারাদিন? সেই জন্যই হয়তো স্বস্তিকা আজ কলেজে যায়নি।

কয়েক বার বেল বাজিয়েও সাড়া পাওয়া গেল না। স্বস্তিকার অনেক বন্ধু, বেশ কয়েকটা ক্লাবের সে মেম্বার, একটা নাটকের দলে অভিনয় করে। নিশ্চয়ই জন্মদিন কাটাতে গেছে কোথাও। নাটকের কল শো থাকলে বাইরে যেতে হয়। তখন খুব মজা আর হইহই হয়।

স্বস্তিকার মা-ও তো থাকেন এখানে। তিনিও নেই আজ? একতলার

ভাড়াটেদের কারওকে জিজ্ঞেস করে কিছু লাভ নেই, সায়ন্তনী জানে। ভাড়াটেরা নিজেদের মধ্যে যদিও ঝগড়া করে, তবু তারাই আবার এককাট্টা হয়ে মামলা চালাচ্ছে দোতলার বাড়িওয়ালাদের সঙ্গে। তাই তাদের সঙ্গে কথাই বন্ধ। মান্ধাতার আমলের ভাড়াটে, হাস্যকর রকমের কম ভাড়া।

সায়ন্তনী ফিরে যাচ্ছে, তখনই খুলে গেল দরজা। স্বস্তিকা নিজে। মাথার চুল উস্কোখুস্কো, শাড়িটা আলগোছে গায়ে জড়ানো। মুখে কোনও কথা নেই। সায়ন্তনীর প্রথমেই মনে হল, সে কি অসময়ে এসে পড়েছে? দরজা খুলতে দেরি, আলুথালু শাড়ি, এতে একটা ব্যাপারই মনে আসে। স্বস্তিকার নীতিবোধ প্রখর নয়। স্বামীর সঙ্গে বিচ্ছেদ হয়ে গেছে আড়াই বছর আগে। তার পরেও দু'এক জন শয্যাসঙ্গীতে তার আপত্তি নেই।

ইতস্তত করে সায়ন্তনী বলল, আমি এসে পড়ে তোর কোনও অসুবিধে করলাম? একটু পরে আসব? গলার আওয়াজটা অন্য রকম। স্বস্তিকা বলল, না, আয়। ভেতরে সত্যি আর কেউ নেই দেখে রীতিমতন অবাকই হল সায়ন্তনী। কোনও পুরুষমানুষ নেই। স্বস্তিকার মা-ও নেই। স্বস্তিকা বলল, ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। দরজা খোলার কেউ নেই। কাজের মেয়েটা এসে চা করে দেয়। সেও তো আসেনি দেখছি। সন্ধে হয়ে গেল বুঝি।

সায়ন্তনী বলল, আকাশ মেঘলা। মাসিমা কোথায়?
মা তো দশ-বারো দিন এখানে নেই। আমার বউদির একটা মেয়ে হয়েছে।
আজ তোর জন্মদিন, তুই বিকেলবেলা শুয়েছিলি?
জন্মদিন? তুই-ই একমাত্র মনে রেখেছিস সায়ন্তনী। এমনকী আমারও মনে ছিল না।
সে কি, আর কেউ তোকে উইশ করেনি? মাসিমা?
মা এখন অনেক কিছুই ভুলে যায়।
আমারও এখন এমন ভুলো মন হয়েছে, তোর জন্য কিছু আনিনি। একটা চকলেট অন্তত....

সায়ন্তনীর হাত ধরে স্বস্তিকা বলল, তুই বোস তো! বাচ্চা মেয়ে নাকি, যে চকলেট আনবি!
সায়ন্তনী আবার চমকে উঠল। স্বস্তিকার হাত বেশ গরম।
তোর তো জ্বর হয়েছে দেখছি। ওষুধ খেয়েছিস? কোনও ডাক্তার....
জ্বর কি মানুষের হয় না? অত ব্যস্ত হবার কী আছে? এক দিন-দু'দিন জ্বরেই কেউ ডাক্তার দেখায় না!

সায়ন্তনীর মনে পড়ল, বছর তিনেক আগেই স্বস্তিকার জন্মদিনে কী বিরাট পার্টি হয়েছিল লেক ক্লাবে। শুভ্রাংশু নেমন্তন্ন করেছিল একগাদা বন্ধুকে। খুব আড়ম্বর প্রিয় ছিল শুভ্রাংশু, কাটা হয়েছিল একটা মস্ত বড় কেক, তার পর গান হল। বেশি গান গেয়েছিল অরিজিৎ। স্বস্তিকার নাটকে অভিনয় নিয়ে প্রথম আপত্তি শুরু করেছিল শুভ্রাংশু। বাইরে যাবার ব্যাপারে তো একেবারেই মত নেই। এই নিয়ে শুরু হয়েছিল খিটিমিটি। স্বস্তিকা স্বাধীনচেতা। সে স্বামীর

বেশি বেশি স্বামীত্ব মানতে রাজি নয়। নিজের ইচ্ছের স্বাধীনতা নিয়ে বাঁচতে চায় বলেই সে ভেঙে ফেলল বিয়ে। কিন্তু এই কি স্বাধীন ভাবে বাঁচা? জন্মদিন, জ্বর হয়েছে, পাশে কেউ নেই! এতক্ষণ আলো পর্যন্ত জ্বালেনি। হঠাৎ যদি বেশি অসুস্থ হয়, কে তাকে দেখবে? নীচের তলার লোকদের কাছ থেকে কোনও সাহায্য পাওয়া যাবে না।

সায়ন্তনী বলল, তুই এ রকম ভাবে....কারওকে কোনও খবর দিসনি কেন?
ফ্যাকাসে গলায় স্বস্তিকা বলল, ইচ্ছে করল না। উগ্র সাজপোশাক করে পার্টিতে যে নাচে, সে আজ জন্মদিনে একটা ভাল শাড়ি পর্যন্ত পরেনি। তার সমস্ত শরীর ভরা ঔদাসীন্য। এই একাকীত্ব কেমন যেন ভয়ংকর মনে হল সায়ন্তনীর।

সায়ন্তনী আর কতক্ষণ সঙ্গ দেবে। ফিরতে আরও দেরি হলে তার শাশুড়ি বক্র চোখে তাকাবেন। এখান থেকেও এক বার ফোন করে জানিয়ে দিল, তাতেও শাশুড়ি বললেন, সে তোমার যখন সুবিধে হবে এসো। জিতুর বাবার শরীরটাও ভাল নয়, খুব হাঁপাচ্ছেন।

এক বার বেরিয়ে স্বস্তিকার জন্য কয়েকটা ওষুধ কিনে আনল সায়ন্তনী।

একটা ওষুধ ও খাইয়েও দিল। ফেরার পথে স্বস্তিকার এই চেহারাটাই মনে পড়তে লাগল বার বার। অসুস্থতার মধ্যে একাকীত্ব, এতে একটা দারুণ অসহায় ভাব থাকে না?

সায়ন্তনীও দাদার সংসারে ফিরে না গিয়ে আলাদা ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়ে একা থাকার কথা ভাবছিল। সব দিক থেকে স্বাবলম্বী হলেও খুব শরীর খার াপের সময় কি তেজ বজায় রাখা যায়? স্বস্তিকা স্বেচ্ছায় বিয়ে ভেঙেছে, কিন্তু সায়ন্তনীর তো সে রকম কিছু ঘটেনি। অরিজিৎ যদি বেঁচে থাকে, তবে তার এই অনুপস্থিতি সায়ন্তনীর পক্ষে কি চরম অপমানজনক নয়? এ অবস্থায় শ্বশুরবাড়িতেই সে আর কত দিন থাকবে?

এর পর অরিজিতের মৃত্যুসংবাদ পেলে সে কাঁদবে, খুবই আন্তরিক কষ্টের কান্না, ওর জন্য যে তার বুকে অনেকখানি ভালবাসা রয়ে গেছে। অসহনীয় এই বিচ্ছেদ। কিন্তু অরিজিৎ যদি আবার ফিরে আসে? সে কি ভুলে যাবে অপমান?

অনেক রাত পর্যন্ত ঘুম আসে না সায়ন্তনীর। ঘুমের ওষুধ খেয়ে দেখেছে, তাতেও কাজ হয় অনেক দেরিতে। বাড়ির অন্যদের নজর এড়াবার জন্য সে ঘরের আলো নিভিয়ে দেয়। একটা শুধু বেড সাইড ল্যাম্প জ্বেলে বই পড়ার চেষ্টা করে, মন বসে না। মহাশূন্যের পরিপ্রেক্ষিতে যার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল, সে কি হারিয়ে গেল মহাশূন্যে?

জানলায় একটা টক টক শব্দ হতেই চমকে উঠল সায়ন্তনী। যখন তখন বৃষ্টি হচ্ছে বলে কাচের জানলাটা বন্ধ থাকে। বারান্দার দরজাও বন্ধ। সায়ন্তনী দেখল, কে যেন দাঁড়িয়ে আছে বারান্দায়। অলৌকিক কিছুতে বিশ্বাস নেই সায়ন্তনীর। চোর-ডাকাত হতে পারে। পুকুরের দিকটা থেকে কেউ উঠে এসেছে বারান্দায়। মাত্র কয়েক মুহূর্তের চিন্তা। তার পরেই সে কণ্ঠস্বর শুনে চিনতে পারল। অরিজিৎ! তার নাম ধরে ডাকছে। ঠিক যে-পোশাকে সে বাড়ি ছেড়ে গিয়েছিল, গায়ে সেই পোশাক।

==

বারান্দার দরজা খোলার বদলে জানলাটা আগে কেন খুলল সায়ন্তনী? দরজা খুলে প্রত্যাবর্তিত দয়িতের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়াই তো স্বাভাবিক ছিল। সে রকম কিছু না ভেবেই যেন জানলাটা আগে খুলে দেওয়া।

সে কিছু বলার আগেই অরিজিৎ হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, তোমাকে পরে সব বলব। এখন কিছু জিজ্ঞেস কর না। আমি ভেতরে আসতে পারি?
সায়ন্তনী বলল, তুমি....তুমি....বারান্দা দিয়ে....সদর দরজার বেল দিলে না কেন?
অরিজিৎ বলল, আগে তোমার কাছে....অন্যদের এখন জানাতে চাই না। তার আগে আমি জানতে চাই, তুমি কি আমাকে গ্রহণ করতে পারবে?
সায়ন্তনী জিজ্ঞেস করল, তোমার কী হয়েছিল?
অরিজিৎ বলল, সে সব পরে....কিংবা ধরো, এই সাত মাস একেবারে মুছে দিয়ে, চাও কি তুমি....আমি আগের মতন তোমার কাছে ফিরে আসতে পারি?

কয়েক মুহূর্ত নীরব থেকে সায়ন্তনী আস্তে আস্তে বলল, সাত মাস....আমি তো তোমাকেই চাই। কিন্তু তার আগে তোমাকে একটা কথা জানানো দরকার। বিশেষ দরকার। এর মধ্যে আমি এক সময় দুর্বল হয়ে গিয়ে....এক জনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিলাম....হয়তো আমার পেটে....
অরিজিৎ জানলার গ্রিল ধরে বলল, এক জনের সঙ্গে....সে কে?
সায়ন্তনী বলল, তার নাম তোমার জানার দরকার নেই, আমিও তাকে মন থেকে মুছে ফেলব....আমি তোমারই জন্য।
অরিজিৎ বলল, আর এক জন? আচ্ছা, আমি নাম জানতে চাই না, আর কিছু জানতে চাই না। আমি তোমাকে ছেড়ে আর কখনও....
সায়ন্তনী এ বার দরজা খুলে দিয়ে বলল, এসো—
অরিজিৎও দরজা খোলা মাত্র প্রথম আবেগে ছুটে এসে দয়িতাকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করল না। দাঁড়িয়েই রইল বারান্দায়। হঠাৎ ডেকে উঠল সেই রাত-পাখিটা।

==